চেরি প্রেস ;
৩৬, মেছুয়াবাজার রোড, কলিকাতা, শ্রীরসিকলাল পান
মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন

গল্পগুলি ইতঃপূর্ব্বে সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে একত্র সংগৃহীত হইল।

'শোকবিজয়' ও 'লালসা ও সংযম' বাল্যকালে রচিত। নবীন বাবু 'অমিতাভে' 'শোকবিজয়ে'র আখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; এবং রবীন্দ্র বাবু 'কথা'য় 'লালসা ও সংযমে'র কাহিনী দিয়াছেন। ইহাঁদের রচনা প্রকাশিত হইবার পর পূর্ব্বোক্ত গল্প দুটির পুনঃপ্রকাশের আবশ্যকতা ছিল না ; তবু বাল্য-রচনার মায়া অতিক্রম করিতে পারিলাম না। ইতি।

কলিকাতা।
১লা আষাঢ়, ১৩০৭।

শ্রীসুরেশচন্দ্র শর্ম্মা।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়

প্রিয়বরেষু।

সূচী

ডালি

শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

প্রাইভেট টিউটার

প্রাইভেট টিউটার।

১

বিজয়ের প্রথম পত্র।

মন্মথ,

আমি বোসজার মেয়েকেই পড়াচ্ছি। মা'
বারটি টাকা মাইনে পাই, তাতেই এক
যাচ্ছে।

কেমন আছি, জিজ্ঞাসা করেছ।
তোমার মত ভগিনীপতি, এই সুখের
কিসের বল? তবে এক অভাব এই
আমি তোমাদের মত কবি হতে পাল্লেম
এবার থেকে চেষ্টা করে দেখ্‌ব
পড়্‌তে পারি,—কবি হতে
যদিও সুখের বলে মনে হয়
ভুটি পাবার আশায়, আমি
রাজী আছি।

•

সাজি।

আমার ছাত্রীটি বড় শান্ত মেয়ে। বয়স বছর বার তের হবে। কায়েত বামুনের ঘরে আজ কাল মেয়ে বড় হয়েও আইবুড় থাকে,—নীলাম্ ডেকে বর না কিন্‌তে পাল্লে ত আর মেয়ের বিয়ে হয় না। তা', বসুজার টাকার অভাব নাই বটে, কিন্তু পছন্দমত বরও ত জোটা চাই?

আমি যে ঘরে পড়াই, তার সুমুখের ঘরেই সরলার দাদারা পড়ে,—পাশের ঘরে বসুজার বৈঠকখানা। সকালে নি এই ঘরে বসে নিরিবিলি খবরের কাগজ পড়েন, মাঝে ছেলেদের ও মেয়েটির পড়াশুনার খবরও ন। আমি এই তিন বছর সরলাকে পড়াচ্ছি। বেশ উন্নতিও করেছে।

ন্মথ, তুমি কি মনে কর? সরলার মত র মেয়েটির কি রকম বর হবে? আমার াস, সরলা যার হাতে পড়্‌বে, সে বাস্ত-ুষ। শুধু রূপ বলে নয়, আমি রূপের কিন্তু গুণ ও হৃদয় যাকে বলে,— আছে, এমন আর কারও

পড়্‌তে আসে নি; তাই বসে ছি। রোজ ত এমনই সময়ে

প্রাইভেট টিউটার।

সে আসে, আজ এত দেরী কচ্ছে কেন, কে জানে।

তুমি কেমন আছ হে? আমাদের কথা মনে পড়ে?—না, সংসারের কোলাহলে পড়ে ক্রমে সব ভুলে যাচ্ছ?

তোমার বিজয়।

২

সরলার প্রথম পত্র।

শ্রীচরণকমলেষু—

বড় দিদি, তুমি চিঠি লিখিতে বলিয়াছ, আর এত দিন লিখি নাই বলিয়া রাগ করিয়াছ। কিন্তু ভাই, আমি যে মনের দুঃখে আছি, তাহা আর কি বলিব। বাঙ্গালীর ঘরে কেন মেয়ে হয়? দেখ ভাই, মেয়ে না হলে মা-বাপের এত ভাবনা হইত না। আচ্ছা দিদি, বিয়ে কি না হলেই নয়? মা আমার বিয়ের ভাবনা ভেবে ভেবে শুকিয়ে যাচ্ছেন, বাবারও এক তিল বিশ্রাম সোয়াস্তি নেই। আমার মরণ হলেই বাঁচি।

তোমার পায়ে পড়ি, তুমি এ কথা যেন আর কাকেও বলিও না। ভুবন বাবুকেও এ চিঠি দেখিও না, তিনি যেন এ চিঠি না পড়েন। তোমার পায়ে পড়ি, পড়েই ছিঁড়ে ফেল। তোমরা কেমন আছ, লিখিবে।

সাজি।

খোকা কেমন আছে, নূতন ঝি কেমন আছে, তাহা লিখিবে। তোমার শ্বাশুড়ী কি এখনও তোমায় তেমনই বকে? তুমি বল, তোমার শ্বাশুড়ীর বকুনির জ্বালায় তুমি ঝালাপালা হয়েছ; আমার কিন্তু বুড়ীর বকুনির কথা মনে পড়লেই হাসি পায়। তুমি আমার প্রণাম জানিবে।

অধিনী
সরলা।

সুমতির প্রথম পত্র।

সরলা,

তোর চিঠি পড়ে হেঁসে মরি। আগে বিয়ে হোক, তখন তাকে চিঠি লিখে, অধিনী বলে নাম সই করিস্। বড় বোনকে চিঠি লিখে নাম সই করিবার সময় কি লিখিতে হয়, জানিস্ নি?--তুই অত বড় বিদ্বানী, বাবা বাড়ীতে মাষ্টার রেখে পড়াচ্ছেন, আজও একখানা চিঠি লিখ্‌তে শিখ্‌লি নি? কেবল ইংরাজী পড়ে মেম্ হচ্চি বুঝি?

তোর বিয়ে হতে দেরী হচ্চে বলে কত দুঃখ করেছিস্! হবে লো হবে, অত ব্যস্ত কেন? মা-বাপের কাজ মা-বাপ কর্‌বেন, তোর অত মাথাব্যথা কেন? স্পষ্ট কথা বল্ যে এখনও আইবুড় আছিস্, তাই দুঃখ

করে চিঠি লিখেছিস্। তোমার ভাবনা নেই বোন, শীগ্‌গির তোমার বিয়ে দিতে আমি মাকে চিঠি লিখ্‌ছি।

তোমার ভগিনীপতি যে রসিক, তাঁকে আর চিঠি দেখাব কি? প্রাণটা গেল, এমন লোকের হাতেও পড়েছিলাম। এত দিনের পর, এই বুড়ো বয়সে, একটা ভাঙ্গা হারমোনিয়ম কিনে রাত দিন বাজান হচ্ছে, তার কঁ্যা-কোঁ-শব্দে পাড়া শুদ্ধ লোকই অস্থির, তা' খোকাকে ঘুম পাড়াব কি? আবার আমাকেও বলেন শিখ্‌তে। কপালে আগুন!

ও সরলা, তোর মাষ্টারের ভগিনীপতি মন্মথ বাবু, পরিবার নিয়ে এসে, আমাদের বাড়ীর পাশে বাসা করে-ছেন। আমার সঙ্গে তোর মাষ্টারের বোনের ভাই! বড় ভাব হয়েছে। কিন্তু জানই ত তোমার ভগিনীপতি কেমন সদালাপী, তিনি গম্ভীর হয়েই জন্ম কাটালেন,— লোকের সঙ্গে আলাপ প্রণয় তাঁর অদৃষ্টে আর এ জন্মে ঘটিল না। এঁর সঙ্গে মন্মথবাবুর তেমন মেশামিশি হয়নি, আলাপ আছে, এইমাত্র।

খোকার কাল থেকে গা গরম হয়েছে। তোরা সকলে কেমন আছিস, লিখিস্। বাবা, মা, দাদাদের আমার প্রণাম জানাইবে, তোমরা আশীর্ব্বাদ জানিবে।

আশীর্ব্বাদক—সুমতি।

সাজি।

৪

মন্মথ বাবুর প্রথম পত্র।

প্রিয় বিজয়চন্দ্র,—

তোমার চিঠি পাইলাম। তুমি "কবি" হবে বলে ভয় দেখাইয়াছ, কিন্তু তাহার আর বাকি কি? তোমার পত্রে রূপবর্ণনার দৌড়টা কিছু বেশী; আর তোমার অন্তর্দৃষ্টিটাও যেন কিছু অধিকমাত্রায় বেড়েছে বলে বোধ হচ্ছে। আর একটা কথা এই যে, "প্রেম" নিয়ে অত রঙ্গ করিও না। তোমার কঠিন মন, নহিলে তুমি প্রেম লইয়া উপহাস করিতে না। আজ হেসে উড়িয়ে দিচ্ছ বটে, কিন্তু কাল তুমি ধরা পড়্‌তে পার। রবীন্দ্রবাবুর "মায়ার খেলা" দেখেছ? তাতে বেশ একটি গান আছে,—

> "প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।
> কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে?
> গরব সব হায় কখন টুটে যায়,
> সলিল বহে যায় নয়নে!"

বড় ঠিক কথা। অতএব, প্রেমিক কি বিরহবিধুর হবার জন্যে তোমায় বড় একটা চেষ্টাচরিত্র করিতে হইবে না। হয় ত সে আপনি হবে; আর তোমায় ভরসা দিতেছি যে, তখন আমাদের কাছে তুমি সহানু-

ভূতি পাবে। কেন না, মানবপ্রকৃতির প্রতি আমাদের তত বিরুদ্ধভাব নাই।

আচ্ছা, তোমার চিঠিতে তোমার ছাত্রীর অত কথা কেন? আমাদের কাছে সেই কুমারীর রূপগুণের অত বিস্তারিত বিবরণ পাঠানই বা কেন? এখন, সূর্য্যমুখী, কমলমণি, কুন্দ, শান্তি, এমন কি দেবী চৌধুরাণী (সেই ব্রহ্মচর্য্য ও ঘড়া ঘড়া মোহর সমেত) প্রভৃতি বঙ্কিমবাবুর মানসী মেয়েদের যদি বিয়ের কনে ব'লে আমাদের কাছে কেউ নিয়ে আসে, তা' হলেও আমরা ফিরে চাইনে। আমাদের যা আছে, তাই ভাল। কুমারীদের বর্ণনা আর আমাদের কাছে কেন?

যা হোক্—এবার তোমাদের বাড়ীর খবর সব বিশেষ করিয়া লিখিবে। তোমার ছাত্রীর কথা আমরা শুন্‌তে চাইনে।

আমার চিঠিখানা তোমার নিতান্তই অপছন্দ হবে। নূতন যায়গায় এসেছি, কিছু নূতন খবরের আশা তুমি করিতে পার। এখানে একটি নূতন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। তিনি তোমার ছাত্রীর ভগিনীপতি ভুবন বাবু। যা তুমি বলেছিলে সত্য হে! কেবল থ্যাকারের গল্প,—অসহ্য!—অসহ্য!—থ্যাকারে না হলে যেন দুনিয়া চল্‌তো না। কিন্তু থ্যাকারে ধন্য যে তাঁর এমন

সাজি।

ভক্ত পাঠক জন্মেছেন! ভুবন বাবুর প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যও দেখা আছে, বিদ্যাপতির কিছু কিছু মুখস্থ। আর তাঁর বিদ্যাপতি পড়িবার ভঙ্গীটুকুও একটু নূতনতর। যাই হোক, এই মেড়ুয়া-মহলে ভুবনবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়ে, ভাই, বাঁচা গেছে। কথা ক'য়ে, আর সুদীর্ঘ সমালোচনা শুনে, এই প্রবাসে বিকেল বেলাটা এক এক দিন এক রকম কেটে যায়।

তোমার মন্মথ।

৫

সরলার দ্বিতীয় পত্র।

শ্রীচরণকমলেষু,—

দিদি, তোমার রঙ্গ দেখে মরিতে ইচ্ছা করে। তোমার বিয়ের আগে বুঝি তুমি "বিয়ে বিয়ে" করে পাগল হয়েছিলে? সত্যই বুঝি তুমি ও সব কথা মাকে কিছু লিখেছ! মা কাল বলিতেছিলেন,—"মেয়ে এত বড় হয়ে উঠ্‌লো, আজও বিয়ে হোল না, ভেবে ভেবে সরলা আমার শুকিয়ে যাচ্ছে।" কি লজ্জা! তুমি কেন এমন কাজ কল্লে? তোমায় আমি আর চিঠি লিখ্‌বো না।

আমি না হয় ইংরাজী পড়ে মেম হয়েছি; "অধিনী" লিখে দোষ করেছি। তুমি যদি লোহারামের বাঙ্গলা

ব্যাকরণখানাও মাষ্টারের কাছে প. নিজের অজ্ঞাতসারে হলে "আশীর্ব্বাদক" না লিখে "আশীর্ব্বাদিকা" লিখিতে। আর লেখাপড়া শিখ্‌লেই বুঝি "বিদ্বানী" বলে ঠাট্টা কত্তে হয়? তোমাদেরও ত মাষ্টারনী পড়িয়ে যেত। আমার মতন মাষ্টার পেতে ত তুমিও বেঁচে যেতে। পাওনি, তাই বুঝি হিংসা হয়েছে?

মাষ্টার মহাশয়ের বোনের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে শুনে মাষ্টার মহাশয় কত আহ্লাদিত হ'লেন। তার নাম হরিদাসী, নয়? আচ্ছা দিদি, হরিদাসী কেমন দেখ্‌তে? বোনের মুখে যদি ভাইয়ের মুখের আদল এসে থাকে, তা' হলে বোধ হয়, হরিদাসী ভাইয়ের মত বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ, ছোট্ট কপালখানি, পাতলা ঠোঁট, কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুল পেয়েছে। এ দিকে কেমন? —হরিদাসী, মাষ্টার মহাশয়ের মত সাদাসিদে ও শান্ত-শিষ্ট কি না, লিখিবে।

আমরা সকলে ভাল আছি। তোমরা কেমন আছ লিখিবে। খোকা কি সারিয়াছে?

সরলা

সাজি।

পাঠক জন্মেছে ৬

ভুবন বাবুর পত্র।

সরলে!

তোমার সরল হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে তুমি সুমতিকে যে পত্র লিখেছিলে, তাহা দৈবাৎ আমার হস্তগত হয়। বলা বাহুল্য যে আমি তাহা পড়িয়াছি।

"পহিল হি বরষ না পুরল সাধ।"

তোমার অতৃপ্ত হৃদয়ে অনেক আশা জাগিতে পারে। কিন্তু সরলে! সাবধান, এ পৃথিবীতে সকলের সব আশা পূর্ণ হয় না।

থ্যাকারের—নভেলে একটি চরিত্র আছে। সেও তোমার মত প্রথমে তাহার মাষ্টারকে স্নেহচক্ষে দেখিত। শেষে তাহাকে ভালবাসিয়া বেচারী কি কষ্টই না সহ্য করিল! সে তবু বিলাতে। আমাদের এই পতিত ভারতে, বিশেষ এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে, প্রেম ত জন্মগ্রহণ করিবা-মাত্রই প্রেমিকের প্রাণসংহার করে। তাই বিদ্যাপতি বলিয়াছেন,—

"হরি হরি পীরিতি না কর জনি কোই।"

তুমিও মাষ্টারকে স্নেহচক্ষে দেখিতে দেখিতে চাইকি ভালবাসিতে পার। কিন্তু তোমাদের মিলন অসম্ভব।

আমার সন্দেহ হয় যে, হয় ত তুমি নিজের অজ্ঞাতসারে মাষ্টারকে ভালবেসে ফেলেছ। কিন্তু তোমার বাপ তোমায় কখনও গরীবের হাতে সমর্পণ করিবেন না। অতএব সাবধান! লক্ষ্মি, তুমি নিজের মন বাঁধিতে চেষ্টা কর।

আমিও প্রথম বয়সে প্রাইভেট টিউশন কত্তে গিয়ে, একটি ছাত্রের ভগিনীকে ভালবাসিয়াছিলাম। কখনও কখনও তাহাকে চকিতের মত দেখিতে পাইতাম, এই মাত্র। তাহার সহিত কখনও কথা পর্য্যন্ত কহি নাই। কিন্তু সে অতৃপ্তি এখনও হৃদয়ে জাগিতেছে। পুরুষের কঠিন প্রাণে যে প্রেম এত দাগ রাখিয়া যায়, নারীর কোমল প্রাণ যে তাহাতে ক্ষতবিক্ষত হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? আমার কথাগুলি অপ্রীতিকর বোধ হইতে পারে, কিন্তু সরলে! "হিতং মনোহারি চ দুর্ল্লভং বচঃ।"

তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভুবনচন্দ্র মিত্র।

৭

বিজয়ের দ্বিতীয় পত্র।

প্রিয় মন্মথ,

তোমার পত্র পাইয়া বড় আনন্দ লাভ করিলাম। তুমি চিঠিপত্রে আবার তর্ক তুলিতে চাও। কিন্তু আমি

তাতে নারাজ, জানিবে। কেন না, আজ কাল আমি তর্কে বড় প্রস্তুত নই। আটঘাট বেঁধে কথা কওয়া এখন বড় কষ্টকর বলে মনে হয়। সেই যখন প্রথম বয়সে আমাদের "সাহিত্য-সমাজে" তর্ক শুন্‌তে যাওয়া যেত, সেই এক দিন, আর এই এক দিন! আমার সেই তখনকার তর্কযুদ্ধ মনে পড়িলে, এখনও বেশ আমোদ হয়। ক—বাবু অনর্গল বক্তৃতা-ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে যুক্তির লৌহপথ বাহিয়া সবেগে চলিয়াছেন, আর সভ্যগণ নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মত স্থির হয়ে বসে আছেন। আমি এক কোণে সিগারেটের ধূমজালে আচ্ছন্ন হয়ে বসে আছি, এবং মধ্যে মধ্যে তোমাদের সভার সম্পাদক, সেই কুঞ্চিতকুন্তল নবীন কবি বন্ধুর কানে কানে গল্প করিতে গিয়া, "সভায় নীরবে শোনাই বিধি," এই অমূল্য উপদেশ শুনে আবার স্বস্থানে ফিরে বস্‌ছি। আর খ—বাবুর সঙ্গে ক—বাবুর কি প্রতিদ্বন্দ্বিতাই ছিল,—মনে পড়্‌লে এখনও হাসি পায়! তোমার মনে পড়্‌ছে কি,—যেই খ—বাবু ধীরললিতে দু'টি একটি কথা বল্‌তে আরম্ভ করেছেন, ক—বাবু অমনি সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক, তৎক্ষণাৎ নোট-বই বের করে টুক্‌তে বস্‌তেন। তার পর, সেই নোট দেখে দেখে সুতীক্ষ্ণ প্রতিবাদ-বাণ বর্ষণ করা হোতো। আর, তোমা-

দের সমিতির এক জন সভ্য, এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর কি যুগ্ম নাম দিয়েছিল, মনে পড়ে?—ওসমান ও জগৎসিং। কিন্তু এখনও জানা গেল না,—দু' জনের মধ্যে ওস্‌মান কে? ক—বাবুকে তোমরা বক্তা বল্‌তে, কিন্তু যদি মাপ কর ত বলি,—আমার ত ভাই তাঁকে কমবক্তা ছাড়া আর কিছু মনে হতো না।

তুমি দেখ্‌ছি এখনও "সাহিত্য-সমাজের" ঝোঁক কাটাতে পার নি। পত্রেই প্রেম নিয়ে ঝগড়া আরম্ভ কত্তে চাও। আমি দু' কথা লিখি, তার পর তুমি পাঁচ পাতায় ক্রমাগত আমাকে আক্রমণ কর আর কি!

আমি ধীরে সুস্থে দুই চারিটি কথা বলিয়া যাইব মাত্র। এখন কেমন এক রকম হয়ে পড়েছি,—কেবল বহুদিনের গত কথা ভাবিতে ভাল লাগে, বর্ত্তমান যেন বিষের মত বোধ হইতেছে। কেন জান?

মনটাও তত ভাল নয়। কেমন যেন অবসন্ন ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছি। আজ আর তোমায় মনের কথা লিখে কষ্ট দেব না। যদি তুমি অনুমতি দাও, তা' হলে নয় আমি তোমায় জব্দ করিবার জন্য, বারান্তরে যা খুসী লিখিতে আরম্ভ করিব।

আচ্ছা, কে বল্লে যে আমি কঠিন? আমি কখনও এমন কথা বলি নি যে, প্রেম পাগলামী। আমার বক্তব্য

সাজি।

এই যে, ভালবাসা নিয়ে অত নাড়াচাড়া কেন? এই যে কাগজে সব দুগ্ধপোষ্য শিশু থেকে পলিতকেশ বৃদ্ধ পর্য্যন্ত নানাবিধ কবির রকমারী প্রেমের খেয়াল পড়া যায়, সে সব কবিতা, সে সব সেণ্টিমেণ্ট্যাল্ জিনিস জগতে ছড়িয়ে লাভ কি? আমি যদি ভালবেসে থাকি,—ভালবেসে নিরাশ হয়ে থাকি,—কি ভালবেসে সুখী হয়ে থাকি,—সে সব সুখ-দুঃখ আমার হৃদয়ের ভিতরেই বন্দী থাক্ না কেন? তা নিয়ে সমস্ত দুনিয়া ওলট্ পালট্ করিবার কিছু গুরুতর প্রয়োজন আছে, এমন ত বোধ হয় না। তবে বল্‌তে পার, বন্ধুবান্ধব, যাঁরা হৃদয়ের অংশভাগী, লুকোচুরি কত্তে গেলে তাঁদের কাছেও কপটাচরণ কত্তে হয়। কিন্তু আমি বলি, দু' দলে কপটাচার না করে, এক পক্ষেই সেটা সংযত করে রাখা কি সঙ্গত নয়? আমি যদি আজ তোমার কাছে আমার হৃদয়ের দ্বার খুলে দি,—তুমি কি সেখানে বিচরণ করে বিন্দুমাত্র সুখ পাবে? অথচ সেই বৃথা শ্রমের বিরক্তি-টুকু কি সাধ্যমত আমার কাছে লুকোবে না? আন্তরিক সহানুভূতি জগতে বড় অল্প, সেই দুর্লভ রত্ন লাভ করিবার জন্য যদি উপহাস মাথায় করিয়া বহিতে হয়, তবে এ বিড়ম্বনায় কাজ কি?

বাড়ীর খবর আর কি দেব? প্রাণে প্রাণে সকলে

বেঁচে আছে মাত্র। কলিকাতায় থাকিয়া লেখাপড়া শিখিবার জন্য মাসে প্রায় ত্রিশ টাকা খরচ করিয়াছি—এখন মাসে মাসে সেই টাকাটাও আদায় করিতে পারা অসম্ভব! ঝক্‌মারী আর কাকে বলে?

সরলার দিদি সুমতির সঙ্গে হরিদাসীর আলাপ হয়েছে, শুনে সত্যই বড় আহ্লাদ হলো। আমি ভাই তোমার কাছে আর সরলার নাম করবো না। শেষে তুমি মনে করবে, আমি সরলার প্রেমে পড়েছি। তোমাদের অসাধ্য নেই,—বিশেষতঃ, মানুষের মন না মতি, কিসে কি হয়, কে জানে?

তোমায় চিঠি লিখ্‌ছি, না প্রবন্ধ করে তুল্‌ছি, বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। যদি প্রবন্ধ হয়ে থাকে,—তা হ'লে যা হোক একটা নূতন বাঙ্গলা মাসিকের সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দিও—লুফে নেবে।

আজ আর "ইতি" দিতে ইচ্ছা হইতেছে না। যাই, সরলাকে পড়াইয়া আসি। তুমি কিছু বিরুদ্ধ ভেব না,—নিতান্ত অশান্তির সময়েও, সরলাকে যখন পড়াতে যাই, তখন আমি থাকি ভাল। হে কবিবর! তুমি কি ইহার মধ্যে একটা কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের আবিষ্কার করিতে পারিবে না?

বিজয়।

৮

মন্মথ বাবুর দ্বিতীয় পত্র।

প্রিয় বিজয়চন্দ্র,

তোমার পত্র পড়ে এবার বড় সন্দেহ হলো! তোমার মনটা যেন বড় চঞ্চল, কত কি যে লিখেছ,—তার হিসাব করা ভার। তোমার মনের ভিতর যেন একটা কি গোলমাল চল্‌ছে—বলিতে ইচ্ছা করিতেছ,—কিন্তু পারিতেছ না;—সাধ্যমত ঢাকিয়া রাখিতেছ। ব্যাপার কি? বিজয়! আমার কাছে ভাই লুকোচুরি কেন? তুমি ত কোনও কালেই সহানুভূতির প্রার্থী ছিলে না। আজ সে জন্য এত ওকালতী কেন? মনের যে অবস্থায় মানুষ একলা দাঁড়াইতে পারে না,—এক জনের কাঁধে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে চায়, তোমারও যেন সেই দশা বলিয়া মনে হইতেছে।

উপহাস ভাবিও না,—ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিও না। একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি যথার্থ উত্তর দাও—তুমি কি সরলাকে ভালবাস?

তোমার মন্মথ।

৯

বিজয়ের তৃতীয় পত্র।

মন্নু,

তুমি সত্যই মানুষের হৃদয়ের অন্তস্তল দেখিতে পাও —আমায় একবার তোমার সেই শক্তি দিতে পার?— দেখি, সে আমায় ভালবাসে কি না।

তোমার কাছে লুকাইব না, আর লুকাচুরি চলিতেছে না। আজ বলিবই—

"————পর্ব্বতগৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?"

আমারও প্রেমের স্রোত চলিল,—এই আগ্নেয় নিঃস্রব ছুটিল—মন্মথ, তুমি দেখ, কেহ ইহার গতি রোধ করিতে পারিবে না! তোমার অনুমান সত্য, সত্যই আমি ভাল-বাসি—আমার নাকে কানে খৎ, আমার ঘাট হইয়াছে,— আমি ঝক্‌মারী করিয়াছি—হে প্রেম! তোমার আর নিন্দা করিব না। তুমি আমার—এই দীন দরিদ্র গো-বেচারী প্রাইভেট টিউটারের ঘাড় হইতে নামিয়া যাও—আমি বাঁচি। কে বলে, প্রেম করা পাগলামী? কে বলে, প্রেমের কবিতা, কাব্য, সব ছাই! এত দিনে বুঝিলাম, আর শিখাইবার দরকার নাই। হে প্রেম, তুমি রূপজ,

সাজি।

গুণজ, মোহজ, রোগজ, যাই হও, আমায় ছাড়। তুমি সকাম, নিষ্কাম, অকাম, সহেতুক, অহেতুক, যাই হও না কেন, আমায় অব্যাহতি দাও। তুমি আমায় পাকড়াও করিলে কেন? বারটি টাকা মাহিনা পাই, চারিটি টাকা দেশে পাঠাইয়া আটটি টাকায় কথঞ্চিৎ কলিকাতার বাসায় দগ্ধোদর পূর্ণ করি, আর বাঁচিয়া মরিয়া থাকি, আমার উপর তোমার এ জারিজুরী কেন? 'সান্কীর উপর বজ্রাঘাত' কেন? প্রেম! তুমি অন্ধ কে বলে? তাহা হইলে দেখিয়া শুনিয়া আমার মত এমন দুর্ব্বল শিকার বাছিয়া লইলে কিরূপে? আমি কি পারিব? আমায় কি সহিবে? আমি কেমন করিয়া "প্রেমের পাগল" হই বল? আমার পক্ষে লম্বা লম্বা চুল রাখা অসম্ভব,—তেল যোগাইব কেমন করিয়া? রাস্তার ধূলায় ও বিনা তৈলে প্রেমিকের কুন্তলজাল দু' দিনে সন্ন্যাসীর জটা হইয়া যাইবে। সোনার চশমা নাই যে চোখে দিয়া চোখের জল ঢাকিয়া রাখিব। আমায় হাঁটিয়া সহর মাথায় করিয়া উমেদারী করিতে হয়,—লোকের সামনে পড়িলেই যদি আমাকে উর্দ্ধদৃষ্টি হইতে হয় ত আমি গাড়ী চাপা পড়িয়া মরিব। তবে কবিতা লিখিতে বল ত পারি; কিন্তু হাতে কিছু নাই যে ছাপাইয়া শেষে বিনামূল্যে বেচিব। আমার এমন সঙ্গতি নাই যে, নিরাশ হইয়া,

শেষকালে, চন্দন কাঠের পাখা ভাঙ্গিয়া চিতা করিয়া, প্রিয়তমার পত্র কি প্রথম সম্ভাষণের কবিতাগুলি পোড়াইব, তার পর, পিণোর ফরাসী সৌরভ ঢালিয়া চিতা নিভাইব। হে প্রেম! তোমায় দুঃখের কথা বলিব কি, আমি যে জামার একটি বোতাম খুলিয়া রাখিয়া একটু কবিতা করিব, আমার সে গুড়েও বালি। কেন না আমার শ্লেষ্মার ধাত। এই জন্যই 'রাতে চাঁদের পানে চাহিয়া বারে বার কাঁদিতে' পর্য্যন্ত আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। আমি নিতান্ত নালায়েক কম্‌বক্ত; আমার প্রতি তোমার এ জুলুম কেন? সৌখীন বাবুদের কাছে যাও, আমায় ছাড়—কেন এই দীন দুঃখীর ইহকাল পরকাল নষ্ট কর, বল!

মনু, কি পাগলের মত বকিলাম, কিছু মনে করিও না। আমাতে আর আমি নেই। বিজয় অনেক দিন গেছে, আমি তার প্রেত। আচ্ছা মনু, আমার কেন এ দুরাশা? যাহাকে পাইব না,—জানি, প্রাণ কেন তাহাকে চায়, বলিতে পার? সরলা, সরলা।—তোমাকেও বুঝি তাহার কথা লিখিয়াছি? তা হবে।—সেই যে এখন আমার জ্ঞান, ধ্যান, সব।

তুমি ভাই! আমায় দোষ দিও না। প্রেম অন্ধ, তা' ত জান। কে কবে বুঝিয়া শুঝিয়া, হিসাব করিয়া,

সাজি।

ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রেম করিয়াছে? প্রেম কাহারও মুখাপেক্ষা করে না। আমিই না হয়, রুক্ষকেশ, ছিন্নবেশ প্রাইভেট টিউটার, পরাধীন দাস, কিন্তু আমার হৃদয় ত স্বাধীন!

দারিদ্র্য এত দুঃখের! দারিদ্র্য বাঞ্ছিতকে কাড়িয়া লইয়া যায়। আগে ভাই আমার সন্তোষ ছিল, কিন্তু এখন আমি ঘোর অসন্তুষ্ট; কি করিলে পয়সা হয়, বলিতে পার? হায়! আমার মরণের জন্য এ পাপ দারিদ্র্য কোথা হইতে আসিল?—এক প্যাক বাহারে কাগজ কিনিবার সঙ্গতি নাই যে, তাহাকে চিঠি লিখিয়া মনের জ্বালা জুড়াই। এই ছাই-ভস্ম কাগজগুলাতে কি প্রণয়িনীকে চিঠি লেখা যায়? কত কবিতা লিখিয়াছি, কিন্তু পয়সা কই যে, ছাপাইয়া, সাফ্ "তুমি নাও" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া দি, প্রাণটা সুস্থির করি। হায়, হায়, করি কি?

আচ্ছা সরলা কি আমায় ভালবাসে? কখনও কখনও আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, আমি চাহিলেই চোক দুটি অবনত করিয়া, নখ দিয়া খাতার উপর দাগ টানে, নয় ত আঁচলের খুঁট লইয়া আঙ্গুলে জড়ায়। 'ভাল না বাসিলে সে বড়মানুষের মেয়ে আমার দিকে চাহিবে কেন? সে ত আমার মত মুখা-

পেক্ষী উমেদার নয় যে, সদা সর্ব্বদা আমার মুখ প্রতি কাতর দৃষ্টি সন্ধান করিয়া দিন রাত মুখ চাহিয়াই বসিয়া থাকিবে? তবে সেও আমায় ভালবাসে? হায়! হায়! এই সুন্দর বালিকাফুল, এ কি এ যাতনা সহিয়াও ফুটিয়া উঠিবে, না ঝরিয়া যাইবে?

আমারও তোমার মত রবি ঠাকুরের গানটি মনে পড়িতেছে,—

"মরণ রে! তুঁহু মম শ্যাম সমান।"

এখন মরণ! তুমিই আমার সুহৃৎ, সহায়, সব। এস, এই দারুণ অতৃপ্ত বাসনা তুমিই পূর্ণ কর, আমায় শান্তি দাও।

আর কি লিখি, বল। আর কি লিখিয়া তোমায় বুঝাইব যে, আমি—প্রেমের নিন্দুক নহি—একটি শিকার—

শ্রীবিজয়।

১০

সরলার তৃতীয় পত্র।

শ্রীচরণকমলেষু—

দিদি, তোমরা দু' জনে কি পাগল হয়েছ? আমি মাষ্টার মহাশয়ের কথা কি লিখিয়াছি যে, ভুবনবাবু আমায় অমন করিয়া পত্র লেখেন? ভুবনবাবুর চিঠি

সাজি।

পাঠাই, দেখিবে। তোমরা সব করিতে পার। এই চিঠি যদি আর কাহারও হাতে পড়িত, তাহা হইলে মাষ্টার মহাশয়ের সর্ব্বনাশ হইত; আমারও লজ্জার সীমা থাকিত না। তিনি পূজনীয়, গুরু; আমার জন্য তাঁর অনিষ্ট হইলে কি আমার পাপ হইবে না? আমি না হয় আর তাঁহার কাছে পড়িব না। তোমাদের পায়ে পড়ি, এমন ক'রে আর আমার কলঙ্ক রটিও না। মা এ সব মিছে কথা শুন্‌লে একে আর বুঝ্‌বেন, হয় ত গলায় দড়ি দিবেন। আমরা মরিলেই কি তোমরা বাঁচ?

সরলা।

১১

মন্মথ বাবুর তৃতীয় পত্র।

প্রিয় বিজয়,—

তোমার পত্র পড়িয়া প্রথমটা মনে করিতেছিলাম, তুমি ঠাট্টা করিয়া লিখিয়াছ। কিন্তু শেষভাগ পড়িয়া বুঝিলাম, তুমি নিজের পায়ে নিজে কুঠার মারিয়াছ। কিন্তু ভাই, এই প্রাণের যন্ত্রণার' কথা যে আমায় খুলিয়া লিখিয়াছ, ইহাতে আমি চরিতার্থ হইয়াছি। এখন আমি তোমায় উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারিব। তুমি " এই পত্রপাঠমাত্র চাকরী ছাড়িয়া দিবে, আর বসুজার বাড়ীর

ত্রিসীমায় যাইবে না। সরলা তোমার হইবার নয়, ইহা স্থির জানিবে। শুধু তাহাকে দেখিবার আশায় পড়াইতে গিয়া, নিজে মজিও না। এখন তুমি আমার কাছে এস। আমি প্রাণপণে তোমার মন ফিরাইতে চেষ্টা করিব। আমার এই অনুরোধ রক্ষা করিবে, অন্যথা করিও না, পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে।

তোমার মন্মথ।

১২

বিজয়ের চতুর্থ পত্র।

প্রিয় মন্মথ,—

তবে নাকি আমি কবি নই, তবে নাকি আমি প্রেম বুঝিনি! তুমি যাই বল, আর আমি ফিরিব না। হয় সরলা, নয় মরণ, এ দুয়ের এক নহিলে আমার শান্তি নেই। উঃ কি কষ্ট! কি বিরহ! কি যন্ত্রণা! হা দগ্ধোস্মি! হা হতোস্মি! তুমি গোটাকতক নলিনী-পত্র পাঠিয়ে দিও; আমার ষোল আনা বিরহ!—নলিনীপত্রের শয্যায় শুয়ে থাক্‌বো, বিছানায় যে ছারপোকা, রাত্রে ঘুম হয় না।—যদি বিরহীদের শয়নে শুয়ে একটু ঘুমাইতে পারি ত চাই-কি স্বপ্নেও মিলন হতে পারে!

তুমি কি পাগল? ঠাট্টা করে একখানা চিঠি লিখিয়াছি, তুমি সত্য মনে করিয়া লইলে! তোমরা কবিতাই

সাজি।

পড়ে থাক, একখানা চিঠি পড়ে বুঝ্‌তে পার না! আ আমার অদৃষ্ট!

তোমার কথায় এই বার টাকা মাহিনার চাকরীটি ছেড়ে দিয়ে উপোস করে মরি আর কি!

তুমি নিশ্চিন্ত থেক। আমি বেশ আছি;—শারীরিক ও মানসিক, আমার সার্ব্বাঙ্গীন কুশল। আর আমার পূর্ব্ব পত্রখানি ছিঁড়ে ফেলো, যদি দৈবাৎ কারও হাতে পড়ে, একটা গুজব রটিতে পারে। ভদ্রলোকের মেয়ের নামটা করে ভাল হয়নি। এখন পস্তাচ্ছি। বেশ জেন, পত্রে বিন্দুমাত্র সত্য নেই, আগাগোড়া ঠাট্টা করে লিখে গেছি। "ভালবাসার ধার ধারিনে, ভালবাসা কে বা জানে?"

তোমার বিজয়।

১৩

সরলার চতুর্থ পত্র।

শ্রীচরণকমলেষু—

দিদি, তোমাদের মনে এই ছিল? তোমাদেরই বা দোষ কি? সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। নইলে তিল থেকে তাল হবে কেন? তোমাদের কে বল্লে যে, আমি মাষ্টারকে ভালবাসি। তুমি দাদাকে কি লিখেছ, তুমিই জান। দাদা বউকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছেন, বউদিদি

আমায় ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "ছি! মাষ্টারকে কি ভালবাস্‌তে আছে?" আমি ত অবাক্, পৃথিবী দ্বিধা হও, আমি লুকাই। আমি কি অপরাধ করেছি যে, আমার এই কলঙ্ক রটালে? আমি গলায় দড়ি দিয়া না মরিলে আর তোমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছ না। তাই হবে।

সরলা।—

১৪

বিজয়ের শেষ পত্র।

নাগপুর।

প্রিয় মনু,—

আমি এখানে এক জন তুলাব্যবসায়ীর ফারমে একটি ভাল চাকরী পেয়েছি। মাসে ১২৲ টাকা থেকে একবারে ১৫০৲ টাকা। বসুজার বড় ছেলে আমার জামীন, তিনি নিজে চেষ্টা ক'রে, আমায় এই চাকৃরী করে দিয়েছেন। আমি ত প্রথমে অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু শেষে তোমার পত্র পড়িয়া সব বুঝিতে পারিলাম।

তোমার চিঠি re-direct হইয়া এখানে আসিয়াছে। কাজেই অনেক দেরীতে পাইলাম।

তুমি লিখিয়াছ যে, আমি ঠাট্টা করিয়া তোমায় যে চিঠি লিখিয়াছিলাম, সেই চিঠি দু'খানি হরিদাসী চুরি করিয়া পড়িয়া বালিশের নীচে রাখিয়া দিয়াছিল, তার

সাজি।

পর আর পাওয়া যায় নাই। সেই দিন সরলার বোন সুমতি তোমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছিল, এবং অনেকক্ষণ সেই ঘরে ছিল, তাই ভয় করিয়াছিলে যে, হয় ত সুমতিই চিঠিখানি দেখ্‌তে পেয়ে নিয়ে গেছে। তোমার শেষ অনুমান এই যে, যদি সে চিঠি সত্যই সুমতির হস্তগত হয়ে থাকে, তাহা হইলে সে হয় ত চিঠিখানি বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছে; এবং বস্তুজা, শিক্ষক-ছাত্রীর মধ্যে এ ভাবটা বড় গৌরবজনক মনে না করাতে, আমার চাকরীটি গেছে। তোমার অনুমান সত্য—চাকরীটি গেছে, কিন্তু তার চেয়ে ভাল চাকৃরী হয়েছে। আর তোমার আশঙ্কাও সত্য, চিঠিগুলি, সরলার বোন সুমতিই দেখিতে পাইয়া লইয়া গিয়াছিল, তার পর বাপের বাড়ীতে পাঠাইয়াছিল; সেখানেও সকলে ঘটনাটা সত্য মনে করিয়াছে। কেন না, পরবর্ত্তী ঘটনায় তা ছাড়া আর কিছু ত অনুমান করা যায় না। কিন্তু এই প্রহসনের শেষে যে উত্তম মধ্যম জলযোগের ব্যবস্থা হয় নি, সেটা আমার ভাগ্য। আমি সরলার দাদার চিঠিখানি নকল করিয়া দি, পড়িলে বুঝিতে পারিবে, ব্যাপারখানা কি?

"প্রিয় বিজয়,

"তোমার ও সরলার, উভয়ের মঙ্গলের জন্য, তোমার

স্থানান্তরিত হওয়া আবশ্যক। তুমি আজ রাত্রেই নাগপুরে রওনা হও, সেখানে, —ফারমে গিয়া দেখা করিও। তুমি সেখানে চাক্‌রী পাইবে। এই সঙ্গে যে থানকত নোট রহিল, তদ্দ্বারা নাগপুরে যাইবার আয়োজন করিও। আমি তাদের টেলিগ্রাম করিলাম; নাগপুরে গিয়াও তোমার কোনও কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।

"তুমি টাকা লইতে সঙ্কুচিত হইও না। তুমি চাকরী করিতে চলিলে, অনায়াসে এই সামান্য টাকা পরিশোধ করিতে পারিবে। বাবা না থাকিলে আমি প্রাণপণ করিয়াও সরলার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতাম। কিন্তু তাহা হইবার নয়,—দুঃখিত হইও না,—না বলিলে নয়, তুমি কুলীন নও, ধনী নও। বাবার আদরের ছোট মেয়ে, তিনি কিছুতেই রাজী হইবেন না।

"ফাষ্টবুক থেকে আমরা এক সঙ্গে পড়ে আস্‌ছি। তুমি কি আমার একটি কথা রাখিবে না? সরলার কোনও সংস্রবে তুমি থাকিও না। তাকে চিঠি লিখিও না; যদি তার চিঠি পাও, পড়ো না।

"এ কথা যেন কর্ণান্তর না হয়, একটি পরিবারের সম্মান, আশা করি, তুমি রক্ষা করিবে।

"আমার সঙ্গে দেখা করো না। আজ রাত্রেই চলিয়া যাইও,—অন্যমত করিও না।

সাজি।

"পুরুষের মন অনেক বিষয়ে বিক্ষিপ্ত রাখিতে পারিবে। আশা করি, 'প্রতাপের' মত সংযমী হইয়া সংসার-রণে অগ্রসর হইবে।

"সোদরাভিমানী,
শ্রীজগদীশ্বর বসু"

এই ত জগদীশ্বরের চিঠি! চিঠি পাইয়া, নোট ক'খানি লইয়া, সেই দিন রাত্রেই নাগপুরে রওনা হইয়াছিলাম। তার পর, এখানে আসিয়া, এই নূতন চাকরীতে অধিষ্ঠান করিয়াছি। জগদীশ্বরের ৪০০৲ টাকা লইয়াছি বলিয়া কিছু মনে করিও না। চার পাঁচ মাসের মধ্যেই আমি পরিশোধ করিব। আমি কমিশন পাই, তা ছাড়া আপ্‌কেওয়াস্তে রাজাদের দরখাস্ত ও চিঠিপত্র লিখিয়াও কিছু পাইব। আমার টাকা জমিবে, তখন ঋণমুক্ত হইব।

আর, সরলা!—তুমি চিরকাল সুখে থাক। আমি জানি, তোমার অমল মনে বিন্দুমাত্র দাগ পড়েনি। বালিকার প্রেম, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর মেয়ের পূর্ব্বরাগ, ও সব বঙ্কিম বাবুর গাঁজাখুরি।

আর মনু, আমাকেও ত তুমি চেন? যার পেটে ভাত নেই, তার প্রেমে পড়িবার অবসর বড়ই কম, এটা অবধারিত জানিবে।

আমি জগদীশ্বরকে সব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছি। এ সব যে কিছুই নয়, খুব সম্ভব, সে তাহা বুঝিতে পারিবে। সরলার নাম এই রহস্যের ব্যাপারে না জড়াইলে আমার চাকরী হইত না বটে, কিন্তু এটা বড় ভদ্রোচিত হয় নাই। এ জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছি। জগদীশ্বরের কাছে ক্ষমা চাহিয়াছি, সে কি আমায় ক্ষমা করিবে না?

এখন এক কাজ কর দেখি, নাগপুরে বেড়াতে এস না। সন্ধ্যার সময় বাহিরে বসিয়া, এই পর্ব্বতময় প্রদেশের হরিত ছবি দেখিতে দেখিতে নাগপুরের কমলালেবু খাওয়া যাবে। প্রেমের চেয়ে এখানকার লেবু ভাল, আমি তোমায় তা শপথ করিয়া বলিতে পারি।

সফল প্রেমিক

বিজয়।

প্রভা।

আমি যখন ছেলেমানুষ, প্রভা তখন আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিত। পাশাপাশি বাড়ী—দুই পরিবারে খুব আত্মীয়তা ছিল; প্রভা আমায় দাদা বলিত।

ছেলেবেলা আমি বড় দুষ্ট ছিলাম; রাগিলে আর রক্ষা থাকিত না। বদরাগী বলিয়া কেহ আমায় দেখিতে পারিত না। কিন্তু সে জন্য আমার দুঃখ ছিল না। ছোট ছোট ভাই বোনগুলি আমায় দেখিলে ভয়ে পলাইত, কিন্তু প্রভা আমায় ভয় করিত না। আমি কাহার কথা শুনিতাম না, কিন্তু প্রভার কথা আমি কখনও অগ্রাহ্য করিতে পারিতাম না।

আমার বেশ মনে পড়ে, প্রভা আমার খাতা বাঁধিয়া না দিলে, আমার লেখা হইত না। প্রভার সঙ্গে গল্প না করিলে, দিনটা যেন বৃথা গেল, মনে হইত।

২

কিছু দিন যায়। আমার বয়স তখন ষোল বৎসর হইবে।

আমি এখন বাঙ্গলা নভেল পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। ভালবাসা বড় ভাল লাগে, ভালবাসিতে ইচ্ছাও

করে। কিন্তু ভালবাসি কাহাকে, প্রথমটা ঠাহর করিতে পারিতাম না। আর, আমার যে রকম স্বভাব, তাহাতে খুব সহিষ্ণু না হইলে কেহ আমার ভালবাসার অত্যাচার সহিয়া উঠিতে পারিত না।

এই সময়ে আমার মানস-পটে প্রভার অস্পষ্ট ছবি যেন একটু উজ্জ্বল হইয়া জাগিয়া উঠিল। আমায় কেহ ভালবাসে না, কিন্তু প্রভা ত আমায় স্নেহ করে। তাহাকে কত বকিয়াছি, তাহার পুতুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছি, চুল ধরিয়া টানিয়াছি, তাহার চুলের কাঁটা লইয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিয়াছি, সে ত কখন রাগ করে নাই। প্রভা সব হাসিমুখে সহিত; যখন বড় রাগ করিতাম, তখনও কটি কথা কহিত না; কেবল প্রশান্ত নয়নে আমার ানে চাহিয়া থাকিত। শেষে, প্রভার উপর আমি আর রাগ করিতে পারিতাম না। কেমন লজ্জা করিত। মনে করিতাম, আমি কি প্রভার মত হইতে পারি না?

৩

এক দিন ঘন ঘোর বর্ষায় আমরা দু'জনে জানালায় বসিয়া বৃষ্টি দেখিতেছিলাম। আমার মা ঘরে বসিয়া সুপারি কাটিতেছিলেন। একটু পরে আমি উঠিয়া গিয়া ছাদে দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিলাম;—মা বারণ করিলেন,—কিন্তু আমি শুনিলাম না। প্রভা দ্বারের কাছে আসিয়া

দাঁড়াইল ; মা আমাকে খুব বকিতেছিলেন, আমি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করি নাই, কিন্তু দেখিলাম, প্রভার চোক ছল ছল করিতেছে। আমি বলিলাম, "প্রভা, কি হয়েছে?"

প্রভা বলিল, "তুমি ঘরে এসো! মা কত বকিতে-ছেন, তোমারই তো দোষ!" আমার বড় রাগ হইল। প্রভাও আমার দোষ দেখিতে আরম্ভ করিল! আমি দিব্য করিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে লাগিলাম, দোতালার ছাদের নল দিয়া খুব জল পড়িতেছিল, সেইখানে গিয়া দাঁড়াইলাম। প্রভা আবার ডাকিল, আমি শুনিয়াও শুনি-লাম না। খানিকক্ষণ ডাকিয়া ডাকিয়া, প্রভা শেষে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল। আর কেহ হইলে কি করিতাম, বলিতে পারি না; কিন্তু প্রভাকে কিছু বলিতে পারিলাম না।

৪

সেই দিনই আমি জ্বরে পড়িলাম। অনেক দিন মরণাপন্ন হইয়া বিছানায় পড়িয়াছিলাম ;—কত দিন, ঠিক মনে নাই। ভাল হইয়া যখন বিছানায় উঠিয়া বসিতে পারি-লাম, তখন দেখিলাম, প্রভা আমার কাছে বসিয়া আছে। আমি বলিলাম, "প্রভা!"

মা বলিলেন, "প্রভা ত বাবা রাত দিনই তোমার বিছানায় বসিয়া আছে!"

সাজি।

তার পর যখন শুনিলাম, বিকারের ঘোরে কেবল "প্রভা! প্রভা!" করিয়াছি, প্রভা ভিন্ন আর কেহ ঔষধ দিলে ফেলিয়া দিয়াছি, তখন নিতান্তই লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। প্রভা আমার কে? পৃথিবীতে আমার নিজের খেয়াল ভিন্ন আর কিছু ত আমার ভাল লাগিত না। মাঝে হইতে, আমার এই অদমনীয় স্বেচ্ছাচারের স্রোতের মাঝে, শৈলকাননকুন্তলা ক্ষুদ্র উপলভূমির মত, প্রভা কোথা হইতে আসিয়া দাঁড়াইল? আমি বালিশে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িলাম। আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম হইতেছিল, প্রভা তাড়াতাড়ি পাখা রাখিয়া, অঞ্চল দিয়া ঘাম মুছাইয়া দিল। মা পাখা লইয়া বাতাস করিতে আসিতেছিলেন, কিন্তু প্রভা তাঁহার হাত হইতে পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। মা একটু হাসিয়া চলিয়া গেলেন। কে জানে কেন, আমার বড় লজ্জা করিতে লাগিল। কিন্তু কি সুন্দর স্পর্শ! আমার কঠোর প্রকৃতি যেন কোমল হইতে কোমলতর হইয়া আসিতেছিল।

৫

শরীর সুস্থ হইতে লাগিল, কিন্তু অজ্ঞাতসারে যে আমায় অন্য রোগে ধরিতেছিল, তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই।

শেষে যখন বুঝিতে পারিলাম, তখন আর প্রতীকারের পথ রহিল না।

প্রভাকে এখন আর ছাড়িতে ইচ্ছা করিত না। সন্ধ্যার সময় যখন সে বাড়ী চলিয়া যাইত, আমার হৃদয়েও সন্ধ্যার ছায়া পড়িত। তরুণ অরুণের আলোর সঙ্গে সঙ্গে যেই প্রভা আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইত, আমার হৃদয় আলোকিত হইয়া উঠিত।

এখন রাত দিন প্রভা আমার কাছে কাছে থাকে। কিন্তু শীঘ্রই আমাদের মাঝে ব্যবধান আসিয়া দাঁড়াইল।

আমরা যে বাড়ীতে ছিলাম, সে বাড়ীতে আর আমাদের থাকা হইল না। আমরা আর এক পাড়ায় চলিয়া গেলাম। কিন্তু প্রভা মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিত।

হৃদয় কেমন শূন্য বোধ হইত। আমার আর কেহ সঙ্গী ছিল না। কাহারও সহিত মিশিতে পারিতাম না। নিজের উদ্ধত স্বভাব ও সকলের অনাদর লইয়া, অতি কষ্টে কাল কাটিতে লাগিল।

কখনও কখনও প্রভাদের বাড়ী বেড়াইতে যাইতাম। কিন্তু কেমন অপ্রতিভ হইয়া পড়িতাম। অসঙ্কোচে প্রভার সহিত কথা কহিতে, গল্প করিতে পারিতাম না। পূর্ণ আশা লইয়া গিয়া, নিতান্ত শূন্য অবসন্ন হইয়া ফিরিয়া আসিতাম।

৬

প্রভা এখন বড় হইয়াছে। তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হই-তেছে—বর জমীদারের ছেলে, বড়মানুষ। সকলে আহ্লাদ করিতেছে। আমি মুখে কিছু বলিতে পারিলাম না,—কিন্তু অন্তরে অশান্তির সীমা ছিল না।

আমাদের অবস্থা ভাল নয়। আমি শৈশবে পিতৃহীন হইয়াছিলাম,—পিতাও সঙ্গতিশালী ছিলেন না। এক এক বার মনে করিতাম, মুখ ফুটিয়া একবার প্রভাকে চাহিয়া দেখি,—কিন্তু নিজের নিঃস্ব দশা মনে পড়িলে আর সাহস হইত না। তখন অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়া ভাবিতাম, কেন পরের জন্য ভাবিয়া মরি। পরক্ষণে প্রভাকে মনে পড়িত, তখন আর কিছু ভাবিতে পারিতাম না। এই প্রথম আমার শুষ্ক হৃদয়ের উৎস উৎসারিত হইল,—আমার চিরশুষ্ক নেত্রে অশ্রু দেখা দিল।

এক দিন গোপনে শুনিলাম, আমাদের বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু প্রভার পিতা সম্মত হন নাই। মা ও দিদিমায় কথা হইতেছিল। দিদিমার বড় সাধ, প্রভার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। কিন্তু মা বলিলেন, তাহা হই-বার নয়। কেন নয়, তাহা আমি জানিতাম। হায়, কেন আমি প্রভার উপযুক্ত হই নাই!

দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রভাকে দেখিয়া আমার বাসনা আবার জাগিল, অভূতপূর্ব্ব ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইল,—আমি সব ভুলিলাম। সে কি ভাব, বলিতে পারি না; কিন্তু সে রকম আমি আর কখনও হই নাই। আমি ডাকিলাম, "প্রভা!"

প্রভা চমকিয়া উঠিল। কিন্তু কথা কহিল না। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাছে গিয়া প্রভার হাত ধরিয়া আবার ডাকিলাম, "প্রভা!" অশ্রুজলে আমার দৃষ্টি রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। প্রভা চলিয়া যাইবে বলিয়া দ্বারের অভিমুখে যাইতেছিল; আমি তাহাকে আর কিছু বলিতে পারিলাম না, হৃদয়ের প্রবল বেগ সংবরণ করিতে পারিলাম না--তোমরা কিছু মনে করিও না,—আমি মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না,—আমি এই সর্ব্বপ্রথম প্রভাকে চুম্বন করিলাম।

এই প্রথম ও এই শেষ চুম্বন।

উষ্ণ নিশ্বাসে আমি মলয়স্পর্শ অনুভব করিলাম, কিন্তু এক মুহূর্ত্ত। প্রভা নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মত স্থির,—আর তাহার সেই আয়ত কমললোচনে অশ্রুকণা।

সেই মুহূর্ত্তে মনে হইল, আমি কি করিতেছি! পর মুহূর্ত্তে চাহিয়া দেখি, প্রভা তাড়াতাড়ি আমার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

সাজি।

৮

পর দিন আমি মাকে বলিলাম, "আমি বৈদ্যনাথে যাইব।" মা বলিলেন,—"প্রভার বিয়ে না দেখিয়া কি যাওয়া হয়?" আমি কাহারও কথা শুনিলাম না। সেই দিনই বৈদ্যনাথে চলিয়া গেলাম।

ঘনশ্যাম তরুশ্রেণী,—উপলবন্ধুর তরঙ্গায়িত তৃণশূন্য শুষ্ক প্রান্তর, দূরে মেঘের মত নীল পর্ব্বতের ছবি, অন্যমনে তাহাই দেখিতাম।

আজ ২৭শে ফাল্গুন; প্রভার বিবাহ; বড় অস্থির হইয়া উঠিলাম। দূরে নিকটে সবই সমান। নিজে দাঁড়াইয়া কেন নিজের বলিদান দেখিলাম না?

২৮শে ফাল্গুন, বসিয়া কত কি ভাবিতেছি, এমন সময়ে এক টেলিগ্রাম পাইলাম। টেলিগ্রাম পাইয়া চমকিয়া উঠিলাম। পড়িতে পড়িতে আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল,—আবার পড়িলাম,—'প্রভা বোধ হয় বাঁচিবে না, তুমি শীঘ্র এসো।'

প্রভা! প্রভা! আমার হৃদয়ের দেবতা! তুমি কি এত শীঘ্র চলে যাবে?

আমি সেই দিনই রওনা হইলাম। এমন উদ্বেগ আমি জীবনে আর কখনও সহি নাই। ট্রেণে সমস্ত রাত্রিটা যেন দুঃস্বপ্ন বলিয়া বোধ হইল। এ কালরাত্রি কি পোহাইবে না?

৯

প্রত্যূষে হাবড়ায় মেল ট্রেণ পঁহুছিল। আমি ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া একখানা গাড়ী ভাড়া করিলাম। গাড়ী চলিল।

কত যাত্রী হাসিতে হাসিতে বাড়ী চলিয়াছে। কয়েকটা মুটে রাস্তায় দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে গল্প করিতেছে। পোলের উপর হইতে দেখিলাম, জাহ্নবী হাসিতে হাসিতে কলতান তুলিয়া বহিতেছে; ঘাটে কত নর-নারী সানন্দে স্নান করিতেছে; ছেলেরা সাঁতার দিয়া বয়ায় উঠিয়া বসিতেছে, নৌকা ধরিয়া উঠিতে যাইতেছে। সকলেই ব্যস্ত, আনন্দে উৎফুল্ল। এত আহ্লাদ কিসের? তোমরা কি আর আহ্লাদের সময় পাও নাই? লোকের আনন্দ যে[illegible] আমার বিষ বলিয়া বোধ হইতেছিল।

প্রভ[illegible]দের বাড়ীতে গিয়া গাড়ী হইতে নামিলাম। বাড়ীর [illegible]খে রাস্তায় কতকগুলা হাঁড়ি পড়িয়া আছে! তবে,—

বাড়ী[illegible] ভিতর ঢুকিলাম। সম্মুখেই দেখিলাম, সরকার মহাশয়। বুড়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমার গলা জড়াইয়া ধরিল। তবে—তবে—সে আর নাই!

বিব[illegible]হের পরে, বিবাহের বাসরেই প্রভার [illegible]কলেরা হইয়াছিল। রোগশয্যায় শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রভা অন্ত

কথা কহে নাই। যখন ঘোর বিকার, তখনও প্রথমে ঘন ঘন, তার পর ক্রমে অনেকক্ষণ অন্তর, অবসন্ন কণ্ঠে প্রভা কেবল ডাকিয়াছে,—"হেম! হেম!"

যাও প্রভা, আবার আমরা মিলিব। জীবনের পর পারে তুমি আগে গিয়াছ,—বর্ত্তমান এখনই অতীতে মিশিবে, তখন এই জীবনস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে,—এখানে ঘুমাইয়া সেখানে গিয়া জাগিব—তার পর আর কখনও কি তোমায় হারাইব?

বাঘের নখ

বাঘের নখ।

১

সরলা! নামটি তোমার কেমন লাগে? প্রথম যৌবনে যখন আমার বাসনা কামনা সেই প্রথম মুকুলিত হইয়া উঠিতেছিল, তখন এই নাম শুনিলে আমি মুগ্ধ, চকিত হইতাম। হায় সেই প্রথম যৌবন!

সরলাকে যখন প্রথম দেখি, তখন তাহার বয়স আট বৎসর। আমার পিতা বসন্তপুরে কর্ম্ম করিতেন; সরলার পিতাও তথায় বদলী হইয়া আসিলেন। তিনি সপরিবারে কর্ম্মস্থলে আসিয়াছিলেন।

বিদেশে শীঘ্র মিত্রতা হয়। চিরপরিচিতদের মুখ দেখিতে না পাইয়া মানুষ হাঁপাইয়া ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে নূতন পরিচয়লাভে ব্যগ্র হয়। প্রবাসে, যেখানে স্বদেশী জনমানবের গতিবিধি বড় বিরল, সেখানে উৎসুক হৃদয় সহজেই স্নেহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। উভয় পরিবারে প্রথমে আলাপ, পরে মিত্রতা জন্মিল। বন্ধুত্ব শেষে আত্মীয়তায় পরিণত হইল।

সরলাদের বাড়ী একটু দূরে, কিন্তু রোজ আমরা

সাজি।

একত্র খেলা করিতাম। আমি প্রতিদিন সরলাদের বাড়ী খেলা করিতে যাইতাম; সরলা আমার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিত,—দূর হইতে আমায় আসিতে দেখিলে তাহার সুন্দর শ্রী উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিত।

২

চারি বৎসর এই প্রকারে কাটিল। সরলা ভিন্ন আমার অন্য সুখ ছিল না;—আমি তখন সতের বৎসরে পদার্পণ করিয়াছি। এই সময়ে আমি সহসা একদিন নিজের মন দেখিতে পাইলাম।

বাবা দারাগঞ্জে বদলী হইয়াছেন। আমরা বসন্তপুর হইতে চলিয়া আসিলাম। আমার এই প্রথম দুঃখ, অথবা দুঃখের প্রারম্ভ। সে কষ্ট বলিবার নয়। সরলার অশ্রুজলসিক্ত, রোদনলোহিত, আকর্ণবিশ্রান্ত, বিরহকাতর নয়ন দুটি এখনও আমার মনে আছে। সেই শিশির-মাথা যুগল কমল কি জীবনে ভুলিতে পারিব?

৩

দারাগঞ্জে পঁহুছিয়া যেন সব শূন্য বোধ হইল। খেলিবার অনেক সঙ্গী ছিল, কিন্তু কাহারও সহিত খেলিতাম না। আর কিছু আমার ভাল লাগিত না। দারাগঞ্জে আমার একমাত্র সুখ ছিল,—সরলার চিঠি। বসন্তপুরে আমি ভাল ছেলে ছিলাম; দারাগঞ্জে আসিয়া আমার কি

হইল, বলিতে পারি না ;—সেবার স্কুলের পরীক্ষায় আমি পাস হইতে পারিলাম না। বাবা বড় দুঃখিত হইলেন, —আমায় কলিকাতায় পড়িতে পাঠাইলেন।

৪

মেসে থাকি, স্কুলে পড়ি, আর বিস্ময়বিহ্বল হইয়া কোলাহল-পূর্ণ কলিকাতার রাজপথের জনতার দিকে চহিয়া দেখি।

এক বৎসর বাসায় কাটিয়া গেল। পূজার সময় দারাগঞ্জে যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যার একটু পরে বাবার বাসায় পঁহুছিলাম। একবারে বাড়ীর ভিতরে গিয়া ডাকিলাম, "মা!"

কে বীণাবিনিন্দিত স্বরে বলিল, "উপেন দা!"

আমি চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলাম, সরলা! মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া, চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিলাম, সম্মুখে আমার সরলা।

সরলার এমন রূপ আমি আর কখনও দেখি নাই। কি, উজ্জ্বল মধুর মিষ্ট শ্রী! প্রথম বর্ষার তটিনীর যে আবেগ, নববসন্তাগমে ব্রততীর যে হরিত শোভা, প্রথম বিকাশকালে কোরকের যে উদ্ভিন্ন সৌন্দর্য্য,—সরলার ঈষদুদ্ভিন্নযৌবন কমনীয় দেহে সেই সৌন্দর্য্যরাশি মৃদু মৃদু তরঙ্গিত হইতেছিল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত, স্বপ্নাবিষ্টের মত, সরলাকে দেখিতে লাগিলাম।

সাজি।

মার আহ্বানে আমার চমক ভাঙ্গিল; অপ্রতিভ হইয়া, তাড়াতাড়ি মাকে প্রণাম করিলাম। শুনিলাম, সরলার বাবা দেশে গিয়াছেন; সরলার মাকে ও সরলাকে এখানে রাখিয়া গিয়াছেন, ফিরিবার সময় বসন্তপুরে লইয়া যাইবেন।

৫

সরলার বিবাহের কথা হইতেছিল। সরলার বাপ কুলীন, উপযুক্ত পাত্রের অভাবে বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। সরলার মা বলিলেন, "কুলীনের মুখে ছাই, ভাল ঘর ভাল বর না পাইলে আমি মেয়ের বিয়ে দিব না। আমার সোনার প্রতিমা রাজমন্দিরে না দিয়া কুলীনের কুঁড়ে ঘরে পাঠাইব কেন?"

আমার হৃদয়ে সহসা আগ্রহ বড় প্রবল হইল। সরলা আমার হয় না? লজ্জায় মুখ ফুটিল না; কিন্তু আশাও ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

সরলার বাবা দারাগঞ্জে আসিলেন। সরলাদের লইয়া বসন্তপুরে চলিয়া গেলেন। আমার হৃদয় অন্ধকার হইল। যাইবার সময় হরিহর বাবু বলিয়া গেলেন,—"উপেন! কলিকাতায় গিয়া একটা ছোট বাড়ী দেখো। আমি এক বৎসরের ছুটি লইতেছি, কলিকাতায় থাকিব, স্থির করিয়াছি।" তথাস্তু!

৬

কলিকাতায় আসিয়া মহা উৎসাহে বাড়ী খুঁজিতে বাহির হইলাম। একটা বাড়ী ঠিক করিলাম। হরিহর বাবু সপরিবারে কলিকাতায় আসিলেন। আমি ষ্টেশন হইতে তাঁহাদের লইয়া আসিলাম।

হরিহর বাবু বাবাকে চিঠি লিখিলেন,—"যে ক'দিন আমি কলিকাতায় আছি, উপেন আমার কাছে থাক।" বাবা আমাকে হরিহর বাবুর বাসায় গিয়া থাকিতে লিখিলেন। আমি প্রথমে একটু কুণ্ঠিত হইতেছিলাম, শেষে হরিহর বাবুর অগ্রহে সম্মতপ্রায় হইলাম। তার পর সরলা যখন সস্মিতমুখে মিষ্ট তিরস্কার করিয়া বলিল, "উপেন দা'! বড় হয়ে এখন আমাদের পর ভাব", তখন রাজি হইয়া বাসায় ফিরিলাম। পর দিন প্রভাতে বাসা ছাড়িয়া হরিহর বাবুর বাড়ীতে আসিলাম।

৭

এই, বৎসর আমি এফ্. এ. দিয়া পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলাম! হরিহর বাবু অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, আমায় শতমুখে উৎসাহিত করিলেন।

বাবা ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। মাও সঙ্গে আসিয়াছিলেন। সরলার সম্বন্ধ করিবার জন্য প্রত্যহ ঘটকীরা যাতায়াত করিতেছিল, তাহারা মাকে

সাজি।

ধরিয়া বসিল, "ছেলের বিয়ে দাও।" বাবা বলিলেন, "পড়া শুনা শেষ করিয়া বিবাহ করিবে।" মা শুনিবার পাত্র নন, জেদ করিতে লাগিলেন। আশায় ভয়ে আমিও চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। সরলা!—সে আশা কি আছে?

মা ও বাবার দারাগঞ্জে ফিরিবার দিন স্থির হইল। যাত্রার পূর্ব্ব দিন মা বলিলেন, "বাবা, বিয়ে কর।" আমি একেবারে বলিয়া ফেলিলাম, "সরলার সঙ্গে আমার বিয়ে হয় ত করিব।"

শুনিয়া মার মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইল। কেন?

৮

রাত্রি। শুইতে যাইতেছি, বাবা ডাকিয়া বলিলেন, "উপেন! আমার সঙ্গে চল। সব গুছাইয়া রাখিয়া শুইতে যাও, ভোরে আমরা যাত্রা করিব।"

আমার ত সঙ্গে যাইবার কথা ছিল না। সহসা এ বন্দোবস্ত কেন?

আমি দ্বিরুক্তি করিলাম না। কখনও বাপ মার অবাধ্য হই নাই, কলিকাতায় থাকিবারও আপাততঃ বিশেষ কোনও আবশ্যক ছিল না। একটা ট্রঙ্কে খান কত বহি ও কাপড় পুরিয়া ঠিক হইয়া রহিলাম।

ভোরে আমরা কলিকাতা ছাড়িব। প্রস্তুত হইয়া সকলের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম।

সরলা আসিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। সরলার মাকে আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন, "চিরসুখী হও!" আমি মনে মনে বলিলাম, আমার সুখ তোমাদের হাতে।

বাহিরে আসিবার পথে একটা ঘরের দ্বারে সরলা দাঁড়াইয়াছিল। সরলা ডাকিল, "একটা কথা শুনে যাও।" আমি ফিরিয়া দাঁড়াইলাম, বলিলাম, "কি সরলা?"

অসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলাম, সরলার কাছে সঙ্কোচ বা লজ্জা ছিল না। সরলা হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "উপেন দা'! বিয়ে কত্তে যাচ্ছ?"

আমি বলিলাম, "কে বলিল?"

সরলা বলিল, "তুমি জান না?—কাল রাত্রে মা ও সই-মা তোমার বিয়ের কথাই বলিতেছিলেন?"

আমি একটু বিচলিত হইলাম। কেমন একটু সাহস হইল, ইচ্ছা হইল,—দমন করিতে পারিলাম না; বলিলাম, "সরলা! যদি তোমাকে পাই, বিবাহ করিব। নহিলে এ জীবনে নয়।"

সরলা কথা কহিল না। সরিয়া আসিয়া আমার বুকের চেনটি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। সরলা বলিল, "তোমার চেনে ওটা কি? বাঘের নখ?"

আমি বলিলাম, "কেন সরলা?" সরলা আমার মুখে

সাজি।

দৃষ্টি সংযত করিয়া বলিল, "বাঘের নখটা আমায় দাও; দেবে ?"

তুচ্ছ বাঘের নখ, সরলাকে অদেয় আমার কি ছিল? তখনই চেন হইতে খুলিয়া, সোনা দিয়া বাঁধান বাঘের নখটি সরলার হাতে দিলাম। জিজ্ঞাসিলাম, "কি হবে সরলা ?"

সরলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "যত দিন বাঁচিব, আমার কাছে রাখিব।"

জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, কেন? এমন সময়ে বাবা ডাকিলেন, সরলার নিকট বিদায় লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। আমরা কলিকাতা ত্যাগ করিলাম।

সমস্ত পথটা অস্থির হৃদয়ে চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া অতিক্রম করিলাম। সরলা স্মরণচিহ্ন চাহিয়া লইল কেন? সরলাকে কি পাইব না? কে বলিল, আমার বিবাহ? বিবাহ কথাটি মনে হইবামাত্র প্রতিজ্ঞা করিলাম, সরলাকে না পাইলে বিবাহ করিব না। যদি বাবা জোর করেন? তবুও না; কখনও না।

২

দারাগঞ্জে বড় কষ্ট হইতেছিল।

চারি দিকে স্নিগ্ধ শ্যামল বনানী, নির্ম্মল শুভ্র আকাশ, ঘনপত্র তরুশাখায় পাটল নব কিসলয়, হরিত ক্ষেত্রে সোনার

ধান, দূর প্রান্তরে কাশফুলের শ্বেত চামরশোভা,—স্নিগ্ধ, সুন্দর! কিন্তু শান্তি কোথায়?

দারাগঞ্জে সপ্তাহ কাটিয়া গেল। একদিন বসিয়া কি পড়িতেছি, এমন সময়ে বাবা ডাকিলেন। আমার হাতে একখানি চিঠি দিয়া বলিলেন, "পড়।" হরিহর বাবুর হস্তাক্ষর; তিনি বাবাকে পত্র লিখিতেছেন, আমার পড়িবার দরকার? বাবার মুখের দিকে চাহিতেই তিনি আবার বলিলেন, "পড়িয়া দেখ।" হরিহর বাবু লিখিতেছেন,—
নমস্কারা নিবেদনঞ্চ,

"তুমি সরলার সহিত উপেন্দ্রনাথের বিবাহের প্রস্তাব আবার করিয়াছ। কলিকাতায় যখন তুমি এ প্রস্তাব কর, আমার তাহাতে আপত্তি ছিল না। উপেন্দ্রনাথের মত জামাতা লোকের প্রার্থনার বস্তু। কিন্তু কি করিব বল, গৃহিণী তাহাতে কিছুতেই সম্মত নহেন। তাঁহার কন্যাকে তিনি রাজরাণী না করিয়া ছাড়িবেন না।

"সম্প্রতি এক বিপদে পড়িয়াছি। জালালপুরের স্বর্গীয় জমীদার ৺ রামরতন চৌধুরীর পুত্র শরৎকুমার চৌধুরী পড়াশুনা উপলক্ষে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন। গৃহিণী ও সরলা এক দিন বিকালে উমাচরণ বাবুর বাটীতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন বাড়ী হইতে গাড়ীতে উঠেন, সেই সময়ে শরৎকুমার বেড়াইতে যাইতে-

ছিলেন। সরলাকে দেখিয়াই তাঁহার ভারী পছন্দ হইয়াছে,—সেই দিনই শরতের দেওয়ানজী আসিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন। পাত্র ঐশ্বর্য্যশালী বটে, কিন্তু কুলীন নহেন। গৃহিণীর ধনুর্ভঙ্গ পণ, শরতের সঙ্গেই কন্যার বিবাহ দিবেন। আমি কি বৃদ্ধ বয়সে অর্থলোভে কৌলীন্যরত্নে বিসর্জ্জন দিব? আর এ বিবাহে তুমিই বা কি মনে করিবে? যাহা হউক, এ বিষয়ে তুমি আমাকে সুপরামর্শ দিয়া উপকৃত করিবে। এখানকার সকল মঙ্গল। ও বাটীর মঙ্গলাদি লিখিয়া নিরুদ্বেগ করিবে। ইতি তাং ২৪ শে কার্ত্তিক ১২—

"গুণমুগ্ধস্য
শ্রীহরিহর শর্ম্মণঃ।"

আমি পত্র পড়িয়া বাবার হাতে দিলাম। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল?"

আমি আর কি বলিব? বাবা বলিতে লাগিলেন, "চেষ্টার ত্রুটী করি নাই, কিন্তু দেখিতেছি,—সরলার সঙ্গে তোমার বিবাহ অসম্ভব। হরিহর পত্রে যাহাই লিখুন, জমীদার শরৎকে ছাড়িয়া আমার ঘরে কন্যা দান করিবেন না। এ দিকে তোমার গর্ভধারিণী বলিতেছেন, সরলা ভিন্ন আর কাহাকেও তুমি বিবাহ করিবে না, বলিয়াছ। সরলা ভিন্ন দেশে কি আর পাত্রী নাই?"

আমি অধোবদনে নীরব হইয়া রহিলাম। উপেক্ষার শেলটা বড় জোরে বুকে বিঁধিয়াছিল। মনে মনে ভাবিতেছিলাম, টাকাই কি বড়! বাবা আমার দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন,—"কি বল?"

নিরাশেরও সুখ আছে। সে সুখ গর্ব্ব। বলিলাম, "সংসারে টাকাই বড়। আমি টাকা না করিয়া বিবাহ করিব না।"

বাবা বলিলেন, "বেশ কথা!"

১০

সংবাদ পাইলাম, শরতের সঙ্গে সরলার বিবাহ হইয়া গেল। তখন মনে হইতে লাগিল, সরলা এ বিবাহে সুখী হইবে ত? নিশ্চয়। নহিলে সে ত একবার ঘুণাক্ষরেও মনের ভাব জানাইতে পারিত, তাহার অসম্মতি হইলে কিছু আর হরিহর বাবু এ বিবাহে সম্মত হইতেন না। মেয়ের জন্যই ত সব? যাক্, আমার এ চিন্তা কেন?

মধ্যাহ্নে আহার করিতেছি, মা সম্মুখে বসিয়া। মা বলিলেন, "তুই এবার বিয়ে কর; সরলার ত বিয়ে হয়ে গেল। আমিও এবার ঘরে বউ আনি।"

বাবার কাছে চোখের জল ফেলি নাই, কিন্তু মার কাছে চোখের জল রাখিতে পারিলাম না। যে স্নেহে

তন্ময়তা আছে, সেখানে বুঝি লুকোচুরি চলে না। আমি তখনই আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম, "বলিয়াছি ত মা, টাকা না করিয়া বিবাহ করিব না।"

আমি রুড়কীর ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজে পড়িতে গেলাম।

১১

অনেক দিন, প্রায় দশ বৎসর হইল, কলেজ ছাড়িয়াছি, ইঞ্জিনিয়ার হইয়া গবর্মেণ্টের চাকরী করিতেছি। টাকা করিতেছি বটে, কিন্তু তৃপ্তি পাইতেছি না।

দুঃখের উপর দুঃখ। যে অমৃতপ্রস্রবণের ধারায় এত দিন বাঁচিয়া ছিলাম, সে প্রস্রবণও শুকাইয়া গেল। স্নেহের প্রতিমা মা আমার দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। বাবা মাঝে মাঝে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠান,—কিন্তু আর কেন?—আমি উত্তরে লিখি,—"এখনও টাকা করিতে পারিলাম কৈ?"

১২

ঘন ঘোর বর্ষা। মেদুর অম্বরে মেঘের মালা,—অজস্র ধারায় ধরা প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। শীতল উগ্র পবনে কদম্বকেশরমিশ্র সৌরভ বহিয়া আনিতেছে। বৃষ্টিস্নাত তরুলতা উজ্জ্বল, হরিত; দূরে বনমধ্যে কেতকী ফুটিয়া রেণু ও গন্ধ ছড়াইতেছে।

আমি একটা বাঁধের তদারকে আসিয়াছিলাম। ডাকবাঙ্গলার বারাণ্ডায় বসিয়া দূরে প্রান্তরে বন্যার জল দেখিতেছিলাম। আকাশ অন্ধকার, প্রকৃতি মলিন, বায়ুর প্রবাহ শীতল, উগ্র,—যেন প্রকৃতির মর্ম্মান্তিক দীর্ঘনিশ্বাস।

বন্যার শান্ত, মলিন জলরাশির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন একখানা দৈনিক কাগজ বাহির করিয়া দেখিতে লাগিলাম। নোট্, প্যারা, তার, কিছুই ভাল লাগিল না। বিজ্ঞাপনস্তম্ভে দৃষ্টিপাত করিয়াই দেখিতে পাইলাম,

"হাজার টাকা পুরস্কার!

"জালালপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু শরৎকুমার চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী সম্প্রতি কলিকাতা হইতে জালালপুরে আসিবার পথে, একটি সোনা-বাঁধান "বাঘের নখ" হারাইয়াছেন। যে কেহ ঐ বাঘের নখটি আমাদের নিকট উপস্থিত করিতে পারিবেন, তাঁহাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। বাঘের নখটির মূল্য ১০৲।১৫৲ টাকার অধিক হইবে না,—যদি কেহ পাইয়া থাকেন, তিনি ফিরাইয়া দিলে উল্লিখিত টাকা পুরস্কার পাইবেন। বাঘের নখের উপরে সোনার পাতে, U. L. M. এই তিনটি ইংরাজী হরফ খোদা আছে।

শ্রীরামেশ্বর রায়।—দেওয়ান, জালালপুর।"

সাজি।

আমার নাম উপেন্দ্রলাল মজুমদার, বাঘনখ-চারমের উপর অক্ষর তিনটা খোদাইয়াছিলাম বটে। কি জানি কেন, এক ফোঁটা চোখের জল কাগজের উপর পড়িল।

*　　*　　*　　*

সেই সময়ে সব্ ওভার্‌সীয়ারটা সেই দিকে আসিয়াছিল,—সে আমার চোখে জল দেখিতে পায় নাই ত?

কমলা

কমলা।

প্রথম।

১

রাজপুর। ৭ই ফাল্গুন, ১২৯৮।

প্রিয় প্রমথ,

বড় দুঃখে তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি। নিরাশার বেদনা বড় তীব্র, পত্রে যদি তাহার লক্ষণ দেখিতে পাও, আশা করি, আমায় ক্ষমা করিবে।

তুমি আজ সাত মাস দেশে আস নাই। এক অজ্ঞাতকুলশীলার মোহে মুগ্ধ হইয়া তুমি, স্বদেশ, স্বজন, স্বার্থ, সব ভুলিয়া আছ, ইহা বিচিত্র হইলেও সত্য। তুমি আমা অপেক্ষা বিদ্যা বুদ্ধি সব বিষয়ে বড়। তোমায় সুপরামর্শ দিবার প্রগল্‌ভতা আমার নাই। কিন্তু বন্ধু জনের স্নেহকোমল চিত্তে সর্ব্বদা আশঙ্কার আবেগ;—তাই করযোড়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি দেশে এসো। যাহা হইবার হইয়াছে; সব ভুলিয়া যাও। তোমার আত্মীয় স্বজনের উদ্বিগ্ন হৃদয়ের যন্ত্রণার কথা বিশেষ করিয়া লিখিয়া আর তোমায় ব্যথা দিতে চাহি না।

শ্রীবিজয়কুমার বসু।

সাজি।

২

কম্বুলিয়াটোলা; কলিকাতা।
১১ই ফাল্গুন, ১২৯৮।

প্রিয় বিজয়,

আজ তোমার পত্র পাইলাম। তুমি বড় দুঃখে এই পত্র লিখিয়াছ;—সম্ভব;—কিন্তু আমার দুঃখও অল্প নহে।

নিজের সহিত সংগ্রামে নিজে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি। অনেক ভাবিয়াছি, অনেক সহিয়াছি, কিন্তু আর ভাবিতেও পারি না, সহিতেও পারিব না।

সাত মাস দেশে যাই নাই; এবং এখন যাইতেও পারিব না। আমি শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছি, আমার নিজের কোনও ইচ্ছা নাই, শক্তি নাই। যা ছিল, সব হারাইয়াছি।

আমি সব জানি ও সব বুঝি। কিন্তু নিরুপায়। এ পৃথিবীতে যাহার সংযম নাই, তাহার মত দুর্ভাগ্য কে?

আমার চিত্ত দুর্ব্বল, বাসনা অদম্য, কিন্তু সঙ্কল্প স্থির। এ অবস্থায় আমি নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিব, আত্মীয় স্বজনের মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার কারণ হইব, তাহা স্বাভাবিক। আমার মত দুর্ভাগ্য, বোধ করি, বড় অল্প; আমি তোমাদের স্নেহের অযোগ্য, কিন্তু সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাদের কৃপা ভিক্ষা করি।

কমলা।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের এত আশঙ্কা, এত উদ্বেগ কেন? পৃথিবীতে যাহার কেহ নাই, তাহাকে যদি আমি আমার বলিয়া গ্রহণ করি, তাহাতে কাহার কি ক্ষতি? এ জগতে মানুষের অনেক কর্ত্তব্য আছে, স্বীকার করি; তোমাদের বিধানে যাহার বিধি নাই, এমন কাজ করিয়াও কি জীবনটা কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত করা যায় না? চিরাচরিত প্রথার যূপ-মূলে জীবন-বলি না দিলে কি মানুষের সকল কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ থাকে? তোমাদের বিধি তোমরাই বুঝিতে পার; আমার বুঝিবার প্রবৃত্তিও ক্রমে লুপ্ত হইয়া আসিতেছে।

আমি শারীরিক ভাল আছি,—এবং যদি বিশ্বাস কর ত বলি, আমার জন্য তোমাদের আশঙ্কার বিশেষ কোনও কারণ নাই।

প্রমথ।

৩

কম্বুলিয়াটোলা; কলিকাতা।
১১ই ফাল্গুন, ১২৯৮।

প্রিয় কমল,

যদি অনুমতি দাও, আজ তোমাকে একবার দেখিতে যাই। তুমি দেখা করিতেও এত কুণ্ঠিত কেন, বলিতে পারি না। যদি আমার দুঃখ বুঝিতে, তাহা হইলে এত

সাজি।

কষ্ট দিতে না। আমার জীবন মরণ তোমার হাতে, তুমি বুঝিয়াও তাহা বুঝিবে না, এই আমার দুঃখ।

তোমার প্রমথ।

৪

প্রমথ বাবু,

আমার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিয়াছেন কেন? আমি সহস্রবার আপনার পায়ে ধরিয়া বলিয়াছি, আজিও মিনতি করিয়া বলিতেছি, আমায় ক্ষমা করুন। আপনার দয়া আমি কখনও ভুলিব না। আপনি আমার উপকার করিয়াছেন, আপনার যাহাতে মন্দ হয়, তাহা আমি প্রাণ থাকিতে কখনও করিব না। আপনি অনুমতি করুন, আমি এখান হইতে চলিয়া যাই। আপনার প্রাসাদে আপনি আসুন, আমার জন্য আপনি গৃহত্যাগী হইয়া থাকিবেন কেন?

কমলা।

৫

কলিকাতা। ১৫ই ফাল্গুন, ১২৯৮।

প্রিয় কমল,

তোমার ক্ষমা ভিক্ষা করি। আমার উপর রাগ করিও না; অনেক কথা বলিবার ছিল, তাই তোমার নিষেধ না মানিয়াও তোমাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। আমায় ক্ষমা করিবে কি না বল?

তুমি ভুল বুঝিয়াছ—আমার দয়া মায়া নাই,—স্বার্থ আমার সর্ব্বস্ব। সেই স্বার্থের জন্যই তোমার সাধনা করিতেছি। বোধ করি, তুমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছ। তাই আমার কাতর প্রার্থনাও কানে শুনিতে পাও না, আমার দুঃখ দেখিয়াও দেখ না।

তুমি কেন আমার হইতে চাও না,—তাহার দুই কারণ আমি স্থির করিয়াছি। প্রথম,—তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না;—দু' দিনের মোহ দু' দিনে যাবে, তার পর তুমি পথে বসিবে, এই তোমার আশঙ্কা। দ্বিতীয়,—আমার আত্মীয় স্বজন কি ভাবিবে, আমার মান মর্য্যাদার দশা কি হইবে। ইহা ভিন্ন আর কোনও কারণ ত আমার মাথায় আসিতেছে না।

ইহার উত্তরে বলি,—আমাকে বিশ্বাস কর। আমি বিশ্বাসের ভিত্তি গড়িয়া দিতেছি;—এস,—আমি তোমাকে বিবাহ করি। আমি কি তোমার এতই অযোগ্য? আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আজন্ম আমি দাম্পত্য-ধর্ম্ম পালন করিব। যদি চিরদিন তোমার সাধনা করি, তুমি কি কখনও আমায় ভালবাসিতে পারিবে না?

আর আমার আত্মীয়, স্বজন, মান, মর্য্যাদা, গৌরব, এ সব আমি তুচ্ছ মনে করি। তোমাকে আমি ভালবাসি,—আমার করিব, ইহাতে যদি আমার মান যায়,

সাজি।

যাক। আত্মীয় স্বজন যদি আমাকে পরিত্যাগ করেন, আমি নিরুপায়।

আমি আর এ সংশয়ে থাকিতে পারি না। তুমি বল, কি করিবে?

এ জীবনে কখনও তোমার আশা ত্যাগ করিব না, যদি চিরদিন দগ্ধ হই, তবু তোমায় কখনও ভুলিব না। মনে রাখিও,—আমার সুখ দুঃখ তোমার উপর নির্ভর করিতেছে। পাষাণি! আমি তোমার কি করিয়াছি যে, তুমি আমার সকল সুখ হরণ করিতেছ?

প্রমথ।

৬

রাজপুর। ১৬ই ফাল্গুন, ১২৯৮।

প্রিয় প্রমথ,

কাল তোমার পত্র পাইয়াছি। কাল সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি তোমার কথা ভাবিয়াছি। একটা তুচ্ছ বাসনা চরিতার্থ না হইলে মানুষের জীবন চিরদিনের জন্য বিফল হইয়া যায়, এ কথা তোমার মুখে প্রথম শুনিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

আমার পরামর্শ, দেশে ফিরিয়া এসো। দিন কতক অন্য বিষয়ে চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখ,—তখন নিজে বুঝিতে পারিবে, কি তুচ্ছ বিষয়ে আপনাকে মগ্ন করিয়া রাখিয়াছ। কলিকাতায় বিলাসিতার স্রোতে ভাসিতেছ,

এবং এই সব sentimental nonsense লইয়া নিজের অসুখের পথ প্রশস্ত করিতেছ। যদি আপনাকে বর্ত্তমান মোহ হইতে সবলে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্য বিষয়ে লিপ্ত কর, মনটাকে বিবিধ বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখ, তাহা হইলে অল্প দিনে সব ভুলিতে পারিবে।

তুমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সে বংশের মান মর্য্যাদা তোমারই রক্ষণীয়। যদি আত্মসুখের জন্য নিজের অকলঙ্ক বংশগরিমায় কলঙ্কারোপ কর, তাহার পরিণাম অনন্ত অনুশোচনা। পশুরাও আত্মসুখের জন্য বাঁচিয়া থাকে; মানুষও যদি আত্মসুখই জীবনের সার ও চরম লক্ষ্য মনে করে, তাহা হইলে মানবে ও ইতর জীবে কি প্রভেদ থাকে?

সংযম মানুষের প্রধান ধর্ম্ম। মানুষ চিত্তবৃত্তি সংযত করিতে পারে, বিধাতা মানুষকে সে ক্ষমতা দিয়াছেন। তোমার কাছে আমরা সংযমের আশা করিব না কেন?

নীতি, ধর্ম্ম, সমাজের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তুমি একটা সুন্দরী লইয়া কলিকাতায় পড়িয়া আছ, রূপ-তৃষ্ণায় জর্জ্জরিত হইয়া অমৃতভ্রমে বিষপান করিতেছ। ভাবিলেও ক্ষোভে লজ্জায় আমি মর্ম্মাহত হই। তুমি কি এত অধঃপাতে যাইতে পার?

তুমি যাহার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছ, সে কি তোমার

সাজি।

ভালবাসে? তুমি যাহার জন্য নিজের ইহকাল পরকাল নষ্ট করিতেছ, সে তোমার জন্য কি করিয়াছে? তোমার মঙ্গলের জন্য সে কি তোমায় ত্যাগ করিতে পারিত না? যে অবৈধ বন্ধনে বদ্ধ হইয়া আর এক জনকে দুর্নীতির পথে টানিয়া আনে, তাহার প্রতি কেমন করিয়া ঘৃণার পরিবর্ত্তে মানুষের মনে অন্য ভাব আসিতে পারে, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। তোমার মত অনেকে এ পথে গিয়াছে, আপনারা মজিয়াছে, কিন্তু আবার ফিরিয়াছে। তুমিও ফিরিতে পার; কিন্তু তখন তুমি অনুশোচনায় দগ্ধ হইবে। আমি তোমার মন জানি; রূপতৃষ্ণা, উদ্দাম বাসনা, বিলাস মোহ অজর অমর নয়; যখন নিজের দুর্ব্বলতায় নিজে অবসন্ন হইয়া পড়িবে, তখন এই অবৈধ সম্বন্ধ কি চক্ষে দেখিবে, বলিতে পার? আমার মিনতি, নিজের জীবনে সে অনুতাপের বীজ বপন করিও না।

সম্মুখে অনন্ত কর্ম্মক্ষেত্র; এই বিচিত্র জগতে নিজের বিবিধ কর্ত্তব্য সাধন কর। ক্ষুদ্র বন্ধনে, তুচ্ছ মোহপাশে অমর জীবন বন্দী করিয়া রাখিও না। "গতস্য শোচনা নাস্তি;"—অতীতের কাহিনী ভুলিয়া যাও, জীবনে নূতন শক্তি সঞ্চারিত কর, নিজের কর্ত্তব্য পালন কর, কালে স্নিগ্ধ শান্তি লাভ করিবে। বিজয়।

৭

কম্বুলিয়াটোলা; কলিকাতা।
২০শে ফাল্গুন; ১২৯৮।

প্রিয় বিজয়,

তোমার পত্র পাইয়াছি। আমি তর্ক করিতে অক্ষম। আমার সংযম নাই, তাহা আমি স্বীকার করিতেছি। পশুতে আমাতে প্রভেদ অল্প, তাহাও আমি জানি।

তোমরা একটা বড় ভুল করিতেছ। রূপতৃষ্ণা নয়, সত্যই আমি তাহাকে ভালবাসি। আর আমি যাহাকে ভালবাসি, তাহার প্রতি অন্ততঃ তুমি অবিচার করিও না। তাহার অপরাধ কি? ঘটনাচক্রে আমি তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছি—সে নিজে যাহাই হউক,—তুমি তাহাকে যাহা মনে করিয়াছ, তাহা সত্য নহে।

আমার চিত্ত দুর্ব্বল, কিন্তু এখনও অধঃপাতে যাই নাই। রূপ বল, মোহ বল, ভ্রম বল,—কোনও অজ্ঞাত কারণে আমি তাহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছি। আমি তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছি—বিবাহবন্ধন অবৈধ নহে। তুমি আমাকে পাগল বলিবে; কিন্তু—

আজ সকালে তোমাকে এই চিঠি লিখিতে বসিয়াছিলাম। লিখিতে লিখিতে কমলার একখানি পত্র

সাজি।

পাই,—তাই তোমাকে আর লিখিতে পারি নাই। কমলার পত্র তোমায় নকল করিয়া দিতেছি,—

"আমি আপনাকে কখনও বিবাহ করিব না। দুঃখিনাকে আর দুঃখ দিবেন না। আমাকে বিবাহ করিলে সকলে আপনাকে ঘৃণা করিবে, তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না। আমি মরিলে যদি আপনি সুখী হন, আমি স্বচ্ছন্দে মরিতে পারি। কিন্তু আপনার যাহাতে মন্দ হইবে জানি, তাহা আমি প্রাণান্তেও করিব না। পায়ে পড়ি, আমার কথা শুনুন। আপনি আমাকে বিবাহ করিলে কখনও সুখী হইতে পারিবেন না। অনুমতি করুন, আমি এখান হইতে চলিয়া যাই।

কমলা।"

এখনও কি তুমি কমলাকে অপরাধিনী মনে করিবে? আজ আমি এইখানেই বন্ধ করি, আর লিখিতে পারিতেছি না।

প্রমথ।

৮

সোমবার।

কমল,

আমি মূর্খ,—তুমি কেন আমার হইতে [illegible] না,—তাহার দুইটি সামান্য কারণ আমার মনে হইয়াছিল।

কমলা।

আজ তোমার পত্র পড়িয়া আর একটি কারণ আমার মাথায় আসিয়াছে, এ জন্য তোমাকে এবং আমার অদৃষ্টকে ধন্যবাদ। বোধ হয়, তুমি আর কাহাকেও ভালবাস—নহিলে "তোমায় বিবাহ করিয়া আমি কখনও সুখী হইতে পারিব না," তোমার এই ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ কি? আগে যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি তোমাকে এত বিরক্ত করিতাম না। ভালবাসা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়,—তাহা হইলে আমিও এত দিন তোমায় ভুলিতে পারিতাম। যাহা আমি পারি নাই, তুমি তাহা পারিবে কেন? তুমি কুণ্ঠিত হইও না; তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহাই আমার সুখ।

প্রমথ।

৯

বিজয়ের টেলিগ্রামের অনুবাদ।

মিনতি, সে রাজী হইলেও বিবাহ করিও না। অন্ততঃ আমার পত্রের প্রতীক্ষা করিও। সহসা কিছু করিও না।

বিজয়কুমার বসু।

১০

কমল,

আমার চিঠির উত্তর কৈ? আমার জন্য ভাবিও

সাজি।

না; আমি আর কখনও তোমায় বিরক্ত করিব না। বল, কিসে তুমি সুখী হইবে?

প্রমথ।

১১

কমল,

এই ক' দিনে তোমার কত চিঠি লিখিয়াছি, তুমি কি এক লাইনও লিখিতে পার না? শুনিলাম, তোমার অসুখ হইয়াছে। পাছে তুমি বিরক্ত হও, তাই আমি দেখিতে যাইতে পারি না। কি অসুখ? আমার উদ্বেগে তোমার লাভ কি, কমল?

প্রমথ।

১২

রাজপুর। ২৩শে ফাল্গুন; ১২৯৮।

প্রিয় প্রমথ,

তুমি পাগল হইয়াছ। নহিলে একটা সন্দিগ্ধচরিত্রা অজ্ঞাতকুলশীলার রূপে ভুলিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিবে কেন? ছি, একবারে অধঃপাতে গিয়াছ?

আমি কলিকাতায় যাইতেছি। তোমাকে আমার সঙ্গে অতি অবশ্য এখানে ফিরিতে হইবে। যদি আমাদের উপর তোমার বিন্দুমাত্র দয়া থাকে, যদি আত্মীয় স্বজনের প্রতি তোমার তিলমাত্র স্নেহ থাকে, পূর্ব্বপুরুষের

কমলা।

পবিত্র স্মৃতিতে যদি জলাঞ্জলি না দিয়া থাক, তাহা হইলে অবশ্য আমার অনুরোধ রক্ষা করিবে। আশা করি, তুমি এখনও পদে আছ,—এখনও আমাদের কথা শুনিবে।

বিজয়।

১৩

"বিরাম-কুঞ্জ"; বরাহনগর।
২৮শে ফাল্গুন; ১২৯৮।

প্রিয় বিজয়,

আমার দেখা পাইলে না বলিয়া কিছু মনে করিও না। আমি তোমার সহিত দেখা করিতাম। কিন্তু দেও-য়ানজীর পত্রে অবগত হইলাম, ছোটমা কলিকাতায় আসিতেছেন—হায়! ছোটমাও যদি বড়মার সঙ্গে স্বর্গে যেতেন!—আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব না। তাই একটু গা-ঢাকা দিয়া আছি।

বেশ আছি। আমার জন্য ভাবিও না। গঙ্গার ধারে সেই মার্ব্বেলের ঘাটে বসিয়া আছি। পাশে মোজে-লের বোতল, সম্মুখে গঙ্গা, বাঁধা ঘাটের পাশে আমার সখের পিনেস্‌খানি তরঙ্গে নাচিতেছে। একবার তরী বাহিব না কি? কি বল?

তোমাদের কোনও ভয় নাই! পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি

সাজি।

বজায় রাখিয়াছি। কমলাকে বিবাহ করি নাই; বিবাহের প্রস্তাবে কোনও মতে তাহাকে সম্মত করিতে পারিলাম না। হোম করিয়া বিবাহ করি নাই, অতএব আইন ও তোমাদের ধর্ম্মমতে বিবাহ হয় নাই। কিন্তু হে বঙ্গীয় বৃদ্ধ বিজয়বাবু! প্রস্তুত হও, একটা নীতিবিরুদ্ধ প্রসঙ্গ তোমার কর্ণে ঢালিতে হইবে,—আমি আর্য্যজাতির সনাতন বা পুরাতন পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছি, দুষ্মন্ত প্রভৃতির অনুকরণে কমলার গলায় মালা দিয়া গান্ধর্ব্ব-বিধানে তাহাকে গ্রহণ করিয়াছি। যা বলিতে হয় বল, প্রকৃত কথা এই,—কমলা এখন আমার।

ভাল মন্দ, এ সব ভাবিব না, ঠিক করিয়াছি। অতএব, এ বিষয়ে তোমার বক্তৃতা বৃথা। সে পক্ষে মোজেল বরং মন্দ নয়। যতক্ষণ মাথায় থাকে,—আমি যাহা চাই,—ভাল মন্দ মাথায় আসিতে দেয় না।—শুধু কমলা ও মোজেল্! শুধু কমলা ও গঙ্গা! শুধু কমলা ও সৌরভ! শুধু কমলা ও সুখ! শুধু কমলা, কমলা, কমলা!

প্রমথ।

কাল তোমার চিঠি রওনা করা হয় নাই। ভালই হইয়াছে। একটা কথা লিখিতে ভুলিয়াছিলাম, ভ্রম সংশোধন করিয়া দি। তুমি লাটিমের মত ঘুরিয়া না মর,

আমার এই ইচ্ছা। তাহার পরও যদি লাটিম হও, সে তোমার মর্জি! আমি গঙ্গার ধারে আছি শুনিয়া, এ বাগানে আমায় খুঁজিয়া বাহির করিবার আশা করিও না। আমি এখানে আর থাকিব না, আজই পাততাড়ি গুটাইতেছি। তুমি যদি গঙ্গার উভয় তীরে খুঁজিতে খুঁজিতে হরিদ্বার পার হইয়া গোমুখী পর্য্যন্ত ছুটিয়া যাও, তাহা হইলেও আমার দেখা পাইবে না। তবে বরানগরের বাগানবাড়ীতে আমার স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাইবে,—মোজেলের খালি বোতল,—এক রাশি। জানি তুমি 'নীল-ফিতে', নহিলে তোমার জন্য এক আধটা পুরা বোতল রাখিয়া আসিতাম।

ছোটমাকে বলিও, আমি পশ্চিমে বেড়াইতে যাই-তেছি। উদ্বেগের কোনও কারণ নাই; কেন না, আবার ফিরিতেছি, ফকির হইব না। ইহার উপর আর কিছু বলিয়া যদি তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিতে চাও, সে তোমার দায়িত্বে।

যদি বিশেষ কোনও আবশ্যক হয়, আমাদের এটর্ণী B. K. Royএর কাছে আমার চিঠি পাঠিও—তাহা হইলে আমি পাইব। অজ্ঞাতবাস,—কিছু মনে করো না। আমেন!

প্রমথ।

দ্বিতীয়।

১

কালবা দেবী রোড; বম্বে।
৬ই বৈশাখ; ১৩০১।

প্রিয় বিজয়,

বহুদিন তোমাকে চিঠি লিখি নাই। লিখিবার বিষয়ও বিশেষ কিছু নাই। বহুদিন প্রবাসে অতিবাহিত করিয়া মনটা নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আজ পুরাতন চিঠিপত্র দেখিতে দেখিতে তোমার ক'খানি চিঠি পড়িলাম। আজ মনে হইতেছে, তোমাদের স্নেহচ্ছায়ায় ছুটিয়া যাই। বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন বিচিত্র দৃশ্য, মাথার মধ্যে ভিড় করিয়া আছে। নিত্য নূতনের আর আকর্ষণ নাই,—এখন সেই পুরাতন অতীতের জন্য একটা প্রবল তৃষ্ণা অনুভব করিতেছি। কিন্তু তৃষ্ণামাত্র। আবার যদি সেই পুরাতন স্মৃতির রাজ্যে উপস্থিত হই, তখন হয় ত সে সব অত্যন্ত পুরাতন, নিতান্ত অসহ্য বোধ হইবে। আশ্চর্য্য হইও না, নিজের বিষয়ে সত্যই আমি এইরূপ সন্দিহান।

এই দুই বৎসরে তোমাদের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে; আমার নিজের পরিবর্ত্তনও বিস্ময়জনক। আশা করি, তোমাদের পরিবর্ত্তন অসুখের কারণ হয় নাই।

কমলা এখন আমার সঙ্গে;—ভাল কথা, শেষ পত্রে তুমি কমলাকে "সন্দিগ্ধ-চরিত্রা" বলিয়াছ। এই দুই বৎসর কমলাকে দেখিলে তোমার এ ভ্রম থাকিত না। আমি জানিয়া শুনিয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়াছি। কমলার জীবনের সমস্ত কাহিনী আমি তাহার মুখে শুনিয়াছিলাম। তাহার জীবন পবিত্র নয় বটে, কিন্তু এমন পদস্খলন কাহার না হয়? পুরুষের স্বেচ্ছাচারের ক্ষমা আছে,—আর রমণী জীবনে একবার ভ্রম করিলে আর তাহার মার্জ্জনা নাই কেন, বুঝিতে পারি না। তাই কমলাকে আমি বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলাম। আমার মঙ্গলের জন্য কমলা বিবাহে সম্মত হয় নাই—কিন্তু আমার সুখের জন্য সে অনায়াসে আত্মবলি দিয়াছে।—যে অদম্য আবেগে আমি তাহার জন্য পাগল হইয়াছিলাম, সেই তীব্র বিদ্যুৎ তাহা-কেও স্পর্শ করিয়াছিল। আমি তখন অন্ধ, অস্থির;—তখন কেবল মনে হইতেছিল,—যেমন করিয়া হউক, কমলাকে আমার করিব। আমি কমলাকে আমার করিয়াছি, কিন্তু হায় কোথায় তৃপ্তি!

আমার সুখের জন্য যে আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়াছে,—আমি কি তাহার যোগ্য? আমি আত্মসুখের জন্য চির-জীবনের মত তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছি। এ চিন্তা সুখের নহে। কমলার আকারে একটা চিরস্থায়ী বিষাদের ছায়া,

সাজি।

তাহার হৃদয়ে গভীর আত্মগ্লানির বিষম যাতনা, আমি প্রতি পদে অনুভব করি। ভাই বিজয়, এখন বুঝিয়াছি, সুখ সকলের জন্য নয়, জগতে শান্তি বড় দুর্ল্লভ;—কিন্তু বড় চড়া দামে এ অভিজ্ঞতা কিনিতে হইয়াছে!

দারুণ অশান্তি, অত্যন্ত অতৃপ্তি বরং ভাল। কিন্তু এই অসহ অবসাদ আর সহ্য হয় না। আমি এখন অতীতের দুর্ব্বলতায় শ্রান্ত, জীবনভারে ক্লান্ত; অন্ধ পথিকের মত চলিয়াছি;—কিন্তু কেন, কোথায়, কে জানে? এমন উদ্দেশ্যহীন বিফল জীবন বহিয়া ফল কি? তবু বহিতে হয়, এই বিড়ম্বনা!

তোমার প্রমথ।

২

রাজপুর। ১০ই বৈশাখ; ১৩০১।

প্রিয় প্রমথ,

যা আশঙ্কা করিয়াছিলাম, দেখিতেছি, তাই ফলিল। তোমার পত্র পড়িয়া বোধ হইল, তুমি ইতিমধ্যেই অনুতাপে বিদ্ধ হইয়াছ। তখন যদি কথা শুনিতে; যখন প্রতিকারের পথ ছিল, তখন যদি ফিরিতে।

তুমি ভুলের উপর ভুল করিতেছ; যে মোহে তুমি কমলার অপবিত্র জীবনে চরিত্রের পবিত্রতা ঢালিয়া দিয়াছ, তুমি এখনও তাহাতে আচ্ছন্ন। তোমার পূর্ব্ব আচরণ

অনুতাপের যোগ্য, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু তোমার পক্ষেও বক্তব্য আছে। তুমি নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছ বটে, কিন্তু কমলার সর্ব্বনাশ কর নাই, ইহা নিশ্চিত। কমলার পূর্ব্বজীবন জানিয়া তুমি তাহাকে গ্রহণ করিয়াছ,—কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বজীবনের কলঙ্ক যায় না। তোমার এই মূর্খতার আগেও তাহার কিছু ছিল না, এবং পরেও কিছু যায় নাই। অতএব, কমলার সর্ব্বনাশ তুমি কর নাই,—তুমি নিজের সুখের পথে নিজে কাঁটা দিয়াছ। কমলা তাহার উপলক্ষ; ইহাতে যদি অনুতাপের অবকাশ থাকে, তাহা কমলার।

আপাততঃ তোমার উদ্বেগের আরও গুরুতর কারণ উপস্থিত। হরিনারায়ণপুরের চরের মকদ্দমায় তোমার হার হইয়াছে; তুমি যে দেনা করিয়া গিয়াছিলে,—তাহা সুদে আসলে অনেক হইয়া পড়িয়াছে। তোমার মহাজন হাইকোর্টে মাম্‌লা জুড়িয়াছে; সে নিশ্চয়ই ডিক্রী পাইবে। তুমি, এই দুই বৎসর ক্রমাগত জলের মত টাকা খরচ করিয়াছ; তহবিলে এক কপর্দ্দকও সঞ্চিত নাই। যদি এখনও না আস, তাহা হইলে তুমি সর্ব্বস্বান্ত হইবে। অতএব, পত্রপাঠ, যে অবস্থায় থাক, কলিকাতায় চলিয়া আসিবে। কোনও মতে অন্যথা করিও না।

তোমার বিজয়।

সাজি।

৩

—কালবা দেবী রোড ; বম্বে।

প্রিয় বিজয়,

ভুল দিয়া ভুল ঢাকা যায় না। তোমার স্নেহ অমূল্য, কিন্তু তোমার চেষ্টা বিফল।

কুচক্রে পড়িয়া একবার তাহার পদস্খলন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহার পর? তাহার বর্ত্তমান যাতনার কারণ কে? আমারই বোঝা উচিত ছিল,—কিন্তু আমি বুঝি নাই। তাহার পরও আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করি নাই,—স্বার্থপরের হৃদয়ে কাহারও স্থান নাই। কমলা যদি নিজের দুঃখে নিজে দগ্ধ হইত, তাহা বরং আমি সহিতে পারিতাম। সে যে আপনাকে আমার দুঃখের কারণ ভাবিয়া মর্ম্মে মরিতেছে, ইহা অপেক্ষা আমার আত্মগ্লানির কারণ আর কি হইতে পারে? যদি আমার জন্য দুঃখ করিতে কুণ্ঠিত না হও, তাহা হইলে কমলার জন্যও দুঃখ করিতে পার। আমার তুলনায় সে দেবতা; যদি যথার্থ সহানুভূতির যোগ্য কেহ থাকে, তবে সে কমলা।

আমার বৈষয়িক অবস্থার কথা শুনিয়া আমি সুখী হইয়াছি। সকলে স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করে, আমি করিব না কেন?

কমলা।

আমার প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। আমার সর্ব্বস্ব যায় যায় শুনিয়া আমার মনে একটু শান্তি আসিয়াছে। যখন সব যাবে, তখন আর একবার খবর দিও। তাহার অপেক্ষা প্রিয় সংবাদ তুমি আর কখনও দিতে পারিবে না। যায় যাক্, থাকে থাক্, আমি স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছি—কোথায় ভাসিয়া যাই, দেখি।

যাহার চিত্তে সুখ নাই, বিত্তে তাহার আবশ্যক? যাহার জীবনে কোনও আশা নাই, তাহার পক্ষে ঐশ্বর্য্য দারিদ্র্য উভয়ই সমান। তোমরা কেন উদ্বিগ্ন হইতেছ? সুখ হউক, দুঃখ হউক,—তীব্র কিছু দাও, এমন নিশ্চেষ্ট অবশ জীবন আর বহন করা যায় না।

তোমার প্রমথ।

তৃতীয়।

১

কম্বুলিয়াটোলা; কলিকাতা।
৭ই জ্যৈষ্ঠ; ১৩০১।

প্রিয় বিজয়,

অসম্ভব। সুখে শ্রান্ত হইয়াছি, আর আমি সুখ চাহি না। সুখের প্রলোভন আমার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর,—এখন নীরবে জীবনের অবশিষ্ট কয় দিন কাটাইতে দাও।

সাজি।

তুমি কি বলিতে চাও, স্বার্থের মন্দিরে একটি নিরীহ বালিকার ইহজন্মের আশা ভরসা বলি দিব? সত্য, আমি জীবনের প্রথম পদক্ষেপেই ভুল করিয়াছি, আপনাকে অধঃপাতের শেষ সীমায় আনিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু এখনও এত দূর নীচ হই নাই।

আমি কোনও মতে বিবাহে সম্মত নহি। আমি এই মরুময় জীবনে কেমন করিয়া নূতন আশালতা রোপণ করিব? তাহা কি সম্ভব মনে কর?

জীবনে অনেক দুঃখ, অনেক অবসাদ, অনেক অশান্তি সহিতেছি। যৌবনের মধ্যাহ্নেই আমার হৃদয় জরাজীর্ণ হইয়াছে। কিশোর হৃদয়ের উন্মেষোন্মুখ আশা আকাঙ্ক্ষার অভিনব মুকুল আমি দলন করিতে পারি, তাহা ফুটাইয়া তুলিবার আনন্দ-কিরণ আমার অকালবৃদ্ধ জীবনে মোটে নাই। যে এ অবস্থায় আর একটি তরুণ জীবন নিজের জীবনে জড়াইতে চাহে, সে নিতান্ত স্বার্থপর।

প্রমথ।

২

প্রিয়তম,

কত দিন তোমাকে দেখি নাই। আর আমি তোমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারি না। একবার দেখা দিও;—তোমার কাছে আর কিছু চাহি না,—প্রেম নয়, সোহাগ

কমলা।

নয়; যত্ন নয়, আদর নয়; দয়া নয়, অনুগ্রহ নয়; শুধু একবার তোমার দেখা চাই। আমি তোমায় বিরক্ত করিব না, বিরক্ত করিবার অধিকার আমার নাই। একবার দেখা দিতেও কি তোমার এত আপত্তি?

কমলা।

৩

কমল,

আজ আমি যাইতে পারিব না। নিজে কি করিতেছি, নিজেও তাহা জানি না। আমাকে ক্ষমা করিও। আমি হৃদয়হীন, স্নেহহীন, পশুতুল্য। তুমি তাহা জান। আমার দুর্ভাগ্য, তোমায় আমি সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ দিলাম। হায়! আমার সেই সুখের স্বপ্ন কোথায় গেল?

প্রমথ।

৪

রাজপুর। ১১ই জ্যেষ্ঠ; ১৩০১।

প্রমথ,

মানবজীবন অভ্রান্ত নয়; একবার নিরাশ হইয়াছ, বিপথে গিয়াছ, অতএব চিরদিনের জন্য তোমার জীবন মরুময় হইয়া থাকিবে, স্বভাবের এরূপ নিয়ম নহে।

নূতন করিয়া জীবনযাগ আরম্ভ কর, অতীতের স্মৃতি আহুতি দাও;—অবশ্যই তাহার ফল ফলিবে।

সাজি।

তুমি কেন বিবাহ করিবে না? তোমার হৃদয় কোমল, স্নেহময়, প্রেমপূর্ণ; তুমি একটি বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় স্নেহরসে সিক্ত করিতে পারিবে না? আমি তাহা কখনও বিশ্বাস করিব না।

তবে কথা আছে। যদি কাপুরুষের মত এখনও সেই হতভাগিনীর মায়াজাল ছিন্ন করিতে ভীত হও, সে স্বতন্ত্র। তুমি কি মনে কর,—কমলাকে তুমি যথার্থ ভালবাস? তোমার কি বিশ্বাস, কমলাকে লইয়া তুমি কখনও সুখী হইবে? যদি কমলার মায়া কাটাইতে না পার, তাহা হইলে তোমার আর কোনও আশা নাই।

তোমার ছোটমার বুকে তুমি বজ্রাঘাত করিতেছ; সেটা কি মনুষ্যোচিত মনে কর?

বিজয়।

৫

কলিকাতা। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ; ১৩০১।

ভাই বিজয়,

রাগ করিও না। আমি মরিয়াছি মনে করিলেই ত সব চুকিয়া যায়! মরার উপর আর খাঁড়ার ঘা কেন?

কমলাকে ভালবাসি, কেমন করিয়া বলিব? যে মন্ত্রমুগ্ধ নেত্রে ইন্দ্রজালের আলোকে তাহাকে দেখিয়াছিলাম, সে অনুরাগরঞ্জিত দৃষ্টি কোথায় গেল? হৃদয়ের অন্তস্তলে

কমলা।

মর্ম্মের শোণিতরাগে যে মানসীর ছবি আঁকিয়াছিলাম, তাহা কোথায় মিশিল? সুখসূত্রে আশাফুলে যে মালা গাঁথিয়াছিলাম, তাহা কে ছিঁড়িল? আমার সেই ঘুমের ঘোর, আত্মবিস্মৃতির নেশা, সুখের স্বপ্ন কোথায় গেল?

যৌবনের তরুণ উষায় মনে করিয়াছিলাম, কমলাকে লইয়া সুখী হইব। এখন বুঝিয়াছি, আমি মনুষ্যনামের অযোগ্য, আমার পক্ষে প্রেম অসম্ভব। আমার হৃদয়ে সে বৃত্তি থাকিলে আমি কমলাকে ভালবাসিতে পারিতাম।

আমি নিজের সুখের জন্য অন্যের শান্তি হরণ করিয়াছি; আমার মত নীচ জগতে বিরল।—আমাকে আর নীচতার পথে যাইতে বলিও না। আপনার জন্য আর আমি অন্যের অনাবিল জীবনে অশান্তির বিষ ঢালিতে পারিব না।

প্রমথ।

৬

প্রিয়তম,

আমি তোমার সুখের পথে কণ্টক। দুঃস্বপ্নের মত আমি তোমার জীবন চঞ্চল আকুল করিতেছি। কিন্তু হায়! সে কি আমার ইচ্ছাকৃত অপরাধ?

আর আমি লুকাইয়া রাখিতে পারি না; আমার সর্ব্বস্ব! না চাহিতে কেন আমার হাতে স্বর্গসুখ তুলিয়া

সাজি।

দিলে? যদি দিলে, তবে আবার বিনা অপরাধে কাড়িয়া লইলে কেন?

আমার অদৃষ্টে সুখ নাই, তুমি কি করিবে? তোমার আত্মগ্লানি কেন? এ জগতে আমার সুখের আশা ছিল না,—তুমি চিরদুঃখিনীকে সুখী করিবার চেষ্টা করিয়াছ, তাহাই আমার যথেষ্ট। তুমি যদি বিফল হও, সে দোষ তোমার নহে। তুমি কুণ্ঠিত হও কেন? তুমি একবার এস, একবার দেখা দাও।

কমলা।

৭

কমলা,

আমিই অপরাধী; আমায় ক্ষমা কর। আকাশে মন্দির গড়িব, মনে করিয়াছিলাম; এখন বুঝিতেছি, তাহা অসম্ভব। এ মরু হৃদয়ে কাহারও স্থান নাই।—মনে করিয়াছিলাম, তোমাকে লইয়া সুখী হইব, কিন্তু আমার অদৃষ্টে সুখ নাই। তোমার ও আমার মধ্যে কিসের ব্যবধান, কিসের বাধা, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এ জীবনে সে ব্যবধান ঘুচিবে না। হায়! তুমি আমি কত ভিন্ন! তুমি আমায় ঘৃণা কর, অভিশাপ দাও, আমি শান্তি পাই। তোমার সহিষ্ণুতা, তোমার আগ্রহ, তোমার

কমলা।

অবিচলিত অনুরাগ, আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করে! তোমার স্নেহ তোমার মমতা আমার আর সহ্য হয় না।

প্রমথ।

৮

কলিকাতা।

প্রিয়তম,

আমি কলঙ্কিনী; বিধাতার অভিশাপ আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। অদৃষ্টের নির্ব্বন্ধ, আমি সুখের মুখ দেখিতে পাইব না। তোমার অপরাধ কি? তুমি কেন আমার জন্য আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হও?

অপরাধ আমার। আমি কেন তোমায় দুঃখের সমুদ্রে ডুবাইলাম? আমার পাপস্পর্শে আসিয়া তোমার এই জ্বালা, আমি কেন তোমার কথায় সম্মত হইলাম?

প্রিয়তম, আমার জীবনসর্ব্বস্ব, আমি তোমাকে ভালবাসি; এখন বলিতে দোষ নাই, তোমার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি। যাহার জন্য প্রাণ দিতে পারি, তাহার বুকে বিষের ধারা ঢালিয়া দিলাম কেন? ইহজন্মে আর কেহ আমার মত তুষের আগুনে পুড়িয়াছে কি না, জানি না; আবার পরজন্মেও নরকের আগুনে পুড়িব। তাহাতেও কি আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না?

প্রাণাধিক, তুমি জান, প্রথম যৌবনের অতৃপ্ত

সাজি।

আবেগে আমি বিধবার ব্রহ্মচর্য্যে বিসর্জ্জন দি। আমি আত্মসংযম শিখি নাই; প্রতারকের কুহকে ভুলিয়া আমি নারীধর্ম্মে বঞ্চিত হই। মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায়, এক পলের লালসায় নারীজন্মের সার রত্ন হারাইয়া বুকে যে আগুন জ্বালিয়াছি, তাহা আর নিভিল না। এক দিন, এক মুহূর্ত্ত,—কিন্তু সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। কখন মনে হইত, মরি; কিন্তু ভয়ে পারিতাম না। তখন যদি মরিতাম!

নিজে মরিতে চাহিতাম; কিন্তু যখন জানিতে পারিলাম, আমি না মরিলে আমার শ্বশুরকুলের গৌরব যায়, তখন বিষের বাটী হাতে করিয়া এই তুচ্ছ প্রাণের মায়ায় কাঁদিতে লাগিলাম। পারিলাম না; কত তিরস্কার, কত লাঞ্ছনা সহ্য করিলাম, কিন্তু মরিতে পারিলাম না। সেই দিন এই কলঙ্কিনীর কলুষিত প্রাণ রক্ষা করিবার আশায় গৃহ ত্যাগ করি। তার পর, তুমি আমায় আশ্রয় দাও। আমি দিবসে নিশীথে কত কাঁদিয়াছি, তবু এ কলঙ্ককালিমা ধৌত হইল না; নিশিদিন অনুতাপদহনে পুড়িয়াছি, তবু এ পাপ পুড়িল না!

তার পর তুমি, আমার দেবতা, ধীরে ধীরে আমার অন্ধকার হৃদয়ে প্রবেশ করিলে;—ধীরে ধীরে ধীরে আমার অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয় আলোয় উদ্ভাসিত করিলে! হৃদয়ে

আর কিছু ছিল না, কেবল তুমি! চিন্তায় আর কিছু ছিল না, কেবল তুমি! দিবসে নিশীথে, জাগরণে স্বপ্নে, কেবল তোমায় দেখিয়াছি, তোমায় ভাবিয়াছি। তখন জীবন আনন্দময়, পৃথিবী পুণ্যময়, আকাশ আলোকময় বোধ হইত! কিন্তু দু দিনে সে মধুর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

মনে হইল, আমি পাপীয়সী; আমার দেবতাকে কেন পাপের পথে টানিয়া আনি। তখন স্থির করিলাম, নিজে মরিব, তবু তোমায় কলুষিত করিব না।

কিন্তু তুমি বিধির নির্ব্বন্ধে আমায় সোনার চক্ষে দেখিলে! মনে করিয়া দেখ, আমি কত কাঁদিয়াছি, কত সাধিয়াছি,—তুমি কিছুই গ্রাহ্য করিলে না। আমার জীবনকাহিনী শুনিয়াও তুমি নিরস্ত হইলে না। তুমি আমায় বিবাহ করিতে চাহিলে।

যে পত্রে তুমি বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলে, সেই পত্র পড়িয়া, তোমার অন্ধ আবেগের পরিণাম বিদ্যুতের শিখার মত হৃদয়ে ঝলসিয়া গেল। আমি আমার জন্য ভাবি নাই; তোমার মঙ্গলের জন্য তখনও আমি কঠিন বন্ধনে বুক বাঁধিয়াছিলাম।

তার পর সেই মিলনের জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী! প্রিয়তম, আমার সর্ব্বস্ব, আমার দেবতা, আমার চিত্ত দুর্ব্বল, আমায় ক্ষমা কর; আমি হৃদয়ের আবেগে প্রাণের

উচ্ছ্বাসে তোমার পদতলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলাম। হায়! আমি হতভাগিনী নিজের সুখের আশায় কেন তোমার পবিত্র হৃদয়ে অশান্তির বীজ বপন করিলাম?

সুখ চকিতের জন্য; আমি প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিতাম,—আমার সুখের পরমায়ু অল্প; আমি স্থির জানিতাম, নিভিবার আগে প্রদীপ যেমন উজ্জ্বল হয়, আমার আনন্দও সেইরূপ। জানিতাম, এই উজ্জ্বল আলোক নিভিলে আমি আবার ঘোর অন্ধকারে ডুবিব; কিন্তু এত শীঘ্র, তাহা ভয়ে কখনও মনেও আনিতে পারি নাই।

তার পর কত সহিয়াছি; বুক ফাটিয়াছে, তবু মুখ ফুটিয়া তোমায় কিছু বলি নাই। কেন বলিব? আমি কে? তোমার জন্যই ত আমি!

সুখের পর দুঃখ সহ্য হয় না। স্বর্গসুখ দিয়াছিলে, তাহার পর বড় অনাদর;—বড় কষ্টে কেবল তোমার মুখ চাহিয়া তাহাও সহিয়াছিলাম। আমার নিজের দুঃখ আমি অনায়াসে সহিতে পারি, কিন্তু আমার জন্য তুমি দগ্ধ হও, তাহা কোন প্রাণে সহ্য করিব?

প্রিয়তম, আমার জীবনের আলো, মরণের দেবতা, আমায় ক্ষমা কর। এক দিন, যে দিন শ্বশুরকুলের পরিজনেরা আমার মুখে বিষের বাটী ধরিয়াছিল, সে দিন মরিতে পারি নাই। তখন জীবন বড় সুন্দর বোধ হইয়া-

ছিল। হায় এই সেই জীবন! তখন কেন এ জীবনের মায়া কাটাইতে পারি নাই? এখন বোধ হইতেছে,—মরণ সুন্দর! জীবনের কলরব, বাসনার উচ্ছ্বাস, কামনার উদ্দাম আবেগ, অনুতাপের তীব্র বিষ, আর তোমার জন্য আমার সমস্ত শরীরের সমস্ত হৃদয়ের আকুল আকাঙ্ক্ষা আর সহ্য হয় না। তোমার চরণে অপরাধিনী এই কলঙ্কিনীকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন মরণের কোলে স্নিগ্ধ সুপ্তি লাভ করি।

প্রিয়তম, আমি সুখে মরিতেছি, দুঃখে নয়। তুমি আমার জন্য দুঃখ করিও না। আমি তোমার সুখশান্তির পথে কাঁটা হইয়া থাকিব না। তুমি বিবাহ কর, সুখে থাক,—এ হতভাগিনীর নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাও। যদি কখনও নারীজন্ম পাই, যেন আবার তোমার দাসী হইতে পারি; কিন্তু হে ভগবান, তখন আর ইহলোকে এই নরকযাতনা আমার অদৃষ্টে লিখিও না।

কমলা।

প্রতিশোধ

প্রতিশোধ

১৩০১ সালের ফাল্গুনের শেষে, কলিকাতায় বসন্তরোগের আবির্ভাবে অধিবাসীরা ভয়চকিত হইয়া উঠিল। উত্তরোত্তর রোগের অধিকতর প্রাদুর্ভাব দেখিয়া অনেক বিদেশী লোক সহর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। যাহাদের কলিকাতা ত্যাগ করিবার উপায় নাই, তাহারা কেহ বা শীতলার পূজা দিল, কেহ বা টীকা লইয়া, বিবিধ প্যাটেণ্ট ঔষধ কিনিয়া, আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ক্রমে এই দুরন্ত সংক্রামক রোগ মহামারীর ন্যায় সহর উজাড় করিতে প্রবৃত্ত হইল। অধিবাসীদের আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিল। সকলেই ভয়চকিত; কাহারও মুখে আর অন্য কথা নাই, মনে স্বস্তি নাই।

এই সময়ে পটলডাঙ্গার একটি মেসে কয়েকটি ছাত্র তখনও সাহসে নির্ভর করিয়া বাস করিতেছিল। মড়কের ধূম দেখিয়া মেসের কয় জন পলাইয়াছিল; কেহ বা পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। সকলের মনে ভয়,—কখন কি হয়!

অপরাহ্ণে যশোরের যতীন বসুর ঘরে আড্ডা করিয়া ছেলেরা গুলতান্ করিতেছিল। যতীন মাঝে মাঝে

সাজি।

ছবি আঁকে;—খগেন তাহাকে বলিতেছিল, "তুমি মা শীতলার একখানা ছবি আঁকো।" যতীনের ব্রাহ্মসমাজে গতিবিধি ছিল বটে,—কিন্তু সেও এই দুরন্ত দেবতার সহিত বিদ্রূপ করিতে সম্মত হইল না। তখন সকলে অনাদিকে ধরিয়া বসিল, "ভট্‌চাজ্‌! তোমার রামায়ণ গান শোনা যাক্‌।" যদিও অনাদিচরণ বন্দ্য-বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু মেসে তাহার বিবিধ উপাধি বিদ্যমান। কেহ বলিত ভট্‌চাজ্‌, কেহ ডাকিত শ্বশুর; এবং যতী মাঝে মাঝে তাহাকে যে মিষ্ট সম্বোধনে আপ্যায়িত করিত, তাহাতে বিশেষ কুটুম্বিতা প্রকাশ পাইত। অনাদির সব প্রস্তুত, এখন বাড়ী হইতে মনিঅর্ডার আসিলেই সে রেলে চড়ে।—এক সঙ্গে যাইবে বলিয়া, সে মেসের আর দুই জনকে ধরিয়া রাখিয়াছে।

এমন সময় মেসের ঝি আসিয়া খবর দিল, বামুন-ঠাকুর পলাতক।

ছাত্রের দল তখন সভাভঙ্গ করিয়া বামুন খুঁজিতে গেল। দুই এক জন বেগতিক দেখিয়া অন্য পরিচিত মেসে গিয়া অতিথি হইল। যে দুই জন অনাদির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা সেই দিনই সন্ধ্যার সময় দেশে যাত্রা করিল।

কলিকাতায় তখন বস্তি উজাড় হইতেছিল; যাহারা

মেসে চাকরী করে, তাহারা প্রায় মেসের কাজকর্ম্ম সারিয়া স্ব স্ব বাসায় চলিয়া যায়। এই সব বস্তিতেই তাহাদের আড্ডা। মৃত্যুভয়ে তাহারাও কলিকাতা ত্যাগ করিতেছিল।

অনেক খুঁজিয়াও বামুন পাওয়া গেল না। ছাত্র-মহলে স্থির হইল, সংক্রামক রোগের সময় বাজারে থাবার খাওয়া ভাল নয়; কিন্তু বহু তর্কের পর যখন জঠরাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, তখন অগত্যা বাজারের খাবারে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া যে যার শয্যায় শয়ন করিল।

২

তখনও রাত্রি আছে, কিন্তু প্রভাতেরও অধিক বিলম্ব নাই। উচ্চ ক্রন্দনরোলে প্রথমে যতীনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ক্রমে আর সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। আবার যতীনের ঘরে বৈঠক আরম্ভ হইল। দুইখানা বাড়ীর পরে যে রোগীটি বসন্তে আক্রান্ত হইয়াছিল, এই রাত্রিশেষে তাঁহার সকল যন্ত্রণার অবসান হইল, তাহা বুঝিতে কাহা-রও বিলম্ব হইল না। ঘর অন্ধকার, কেবল রাজপথের একটা গ্যাসের আলো বারান্দার মুক্ত বাতায়নপথে গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহপ্রাচীরের এক অংশে প্রতিফলিত হইতেছিল। সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে ছাত্রদল কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া সেই করুণ ক্রন্দন শুনিতে লাগিল। সহসা

সাজি।

সেই শান্ত নীরবতা ভঙ্গ করিয়া উচ্চকণ্ঠে শব্দিত হইল—"বল হরি, হরিবোল্!"

তখন এক জন বলিল, "আলোটা জ্বালিয়া ফেল না—আর অন্ধকারে বসিয়া থাকা যায় না।"

খগেন বলিল, "আলো ও অন্ধকার, দুই প্রায়ই সমান;—যেমন, জীবন ও মৃত্যু। সেখানে আলো আছে কি না কে জানে;—অন্ধকার সহাইয়া রাখ।"

অনাদি বলিল, "যে আজ্ঞে দার্শনিক মহাশয়, এখন একটু ক্ষমা দিন। যতে! দেশ্‌লাই বার কর্।"

যতীন খানিক খুঁজিয়া দেশলাই বাহির করিল। অনাদি আলো জ্বালিতে গিয়া চিম্‌নীটা ভাঙ্গিল,—এবং সে জন্য বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া, নিজের ঘর হইতে একটা আলো জ্বালিয়া আনিল।

তখন এক জন বলিল, "কি করা যায়?"

অনাদি বলিল, "যঃ পলায়তি স জীবতি। অতএব, এসো, সকলে প্রস্থান করি।"

খগেন বলিল, "আর দুই এক দিন দেখা যাক।"

অনাদি সজোরে তক্তপোষ চাপড়াইয়া বলিল, "নিশ্চয় —যতক্ষণ মনিঅর্ডার না আসে, ততক্ষণ নিশ্চয় আছি।"

এমন সময় যতীনের ষ্টোভের প্রতি অনাদিচরণের চক্ষু পড়িল। সে ষ্টোভ্‌টি জ্বালিয়া, গৃহকোণবর্ত্তী কুঁজা

হইতে কেট্‌লীতে জল ঢালিয়া ষ্টোভে চড়াইয়া দিল। তার পর চা প্রস্তুত করিয়া, যতীনকে বলিল, "তোর কন্‌ডেন্‌ষ্ট্‌ মিল্ক্‌ নেই?"

যতীন বলিল, "না।"

অনাদি তবু একবার চারি দিকে খুঁজিয়া দেখিল। তার পর তাক হইতে চিনির পাত্রটা লইয়া আসিয়া অতি সন্তর্পণে সকলকে এক এক চামচ চিনি দিয়া, অম্লানবদনে নিজের পেয়ালায় চিনির পাত্রটি উপুড় করিয়া বলিল, "দুধের অভাব চিনিতে পূরণ করা গেল। আর চিনির খাতিরেই ত আমার চা খাওয়া।"

যতীন তাহার চিরাভ্যস্ত সুমিষ্ট সম্ভাষণে অনাদিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বিশেষতঃ যদি নিজে কিনিতে না হয়।"

সকলে হাসিতে লাগিল।

প্রভাতে ঝি আসিয়া সদর-দরজায় ঘা দিতে লাগিল। কিন্তু কে নীচে গিয়া দরজা খুলিবে, কিছুতেই আর তাহার মীমাংসা হয় না। অবশেষে যখন ঝির মেজাজ উষ্ণ হইবার উপক্রম হইল, তখন যতীন উঠিয়া দরজা খুলিতে গেল। খগেনও তাহার অনুবর্ত্তী হইল।

ঝি চৌবাচ্চার কলটা খুলিয়া দিয়া, বসন্তের গল্প জুড়িল। তিন দিনের মধ্যে, সেই পাড়ায় ষোলটি,

সাজি।

তাহাদের পাড়ায় বাইশটি, ইত্যাদি যতগুলি মৃত্যুর সংবাদ সে রাখিত, বিস্তারিতভাবে তাহার বর্ণনা করিল। তাহার পর বলিল,—"ঘরের ছেলে ঘরে যাও বাবা, প্রাণ থাক্‌লে ঢের নেকাপড়া হবে।"

বাসায় একটা আতঙ্কের ছায়া পড়িল।

৩

দুই দিন পরে, বেলা তিনটার সময় সকলে একটা ঘরে সমবেত হইয়া পরামর্শ করিতেছিল,—কি করা যায়? এমন সময় অনাদিচরণ কলেজের ফেরত সেই ঘরে প্রবেশ করিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার মণিঅর্ডার এসেছে?"

খগেন বলিল,—"আমি ত সমস্ত দিনই বাসায় আছি,—দেখি নাই।"

অনাদি তক্তপোষের উপর বহিগুলা ফেলিয়া, স্বয়ং গৃহপ্রান্তবর্ত্তী একটা ক্যাম্পটেবিলে বসিয়া, গান ধরিল,—

"এস হে এস পিয়ন সখা!
একবার ওই রূপে দাও দেখা।
তোমার শ্রীচরণে নাগ্‌রা জুতো হে—
ও তায় আগাগোড়া কাদা-মাখা!
তোমার কাঁধে ঝোলে চামড়ার ব্যাগ্ হে—
তাহে ঝন্ ঝন্ বাজে কেবল টাকা।"

অনাদিচরণের সুকণ্ঠ বলিয়া সুখ্যাতি ছিল না।

তাহার সঙ্গীরা "থামো! থামো!" বলিয়া গায়কের মুখ চাপিয়া ধরিল।

এমন সময় এক ঠোঙ্গা খাবার হাতে ঝি সেই ঘরে প্রবেশ করিল। বলিল,—"ওগো! নগেন বাবুর ঘরে গিয়ে দেখি, তিনি বিছানায় পড়ে—জ্বরে কাট ফাট্‌ছে—আমি ত জানি নি—খাবার—"

ঝির কথা সমাপ্ত না হইতেই অনাদিচরণ এক লম্ফে তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া ঠোঙ্গাটি নিজে অধিকার করিল, এবং একখানা খাস্তার কচুরী মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "ঝি! সে জন্য তোমার ভাবনা নেই, এখানে খাবার লোক আছে, খাবার নষ্ট হবে না।"

আর সকলে নগেনের জ্বর হইয়াছে শুনিয়া বড় শঙ্কিত হইল, এবং তাড়াতাড়ি তাহার ঘরে চলিল। অনাদি বলিল, "চল—আমিও যাই,—গান্‌টা নিজে বাঁধিয়াছি, তোমাদের শুনাইয়া দি।"

খগেন বলিল, "গান থাক্—তুমি একবার ডাক্তার দাসকে খবর দাও,—যে সময়, এখুনি ডাক্তার আনা ভালো।"

অনাদি খাবারের ঠোঙ্গাটি নিঃশেষ করিয়া, এক গ্লাস জল খাইয়া,—কাঁধে একখানি চাদর ফেলিয়া, ডাক্তার আনিতে গেল।

সাজি।

৪

নগেনের বয়স বেশী নয়—এখনও যৌবনসীমায় পদার্পণ করে নাই। সম্পন্ন গৃহস্থের সন্তান। কলিকাতায় মেসে থাকে, পড়াশুনা করে।

দুই তিন দিন হইতে তাহার শরীরে যেন স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা,—কিন্তু বেশী নয়; মাথা ভার; ক্ষুধার অভাব। এই রকমে দু' তিন দিন কাটিয়াছিল। আজ স্কুলে তাহার জ্বর আসিয়াছিল। জ্বর-গায়ে স্কুল হইতে হাঁটিয়া আসিয়া সে শয্যার আশ্রয় লইয়াছে। সে জ্বরে এমন অবসন্ন হইয়াছিল যে, মেসের কাহাকেও ডাকিতেও পারে নাই।

ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া গেলেন। গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আজ কিছু বলা যায় না। আমি কাল আবার আসিব।"

মেসের আতঙ্কিত ছাত্রমহলে আশঙ্কা সংশয় ঘনাইয়া আসিল। সকলেরই মনে হইতেছিল,—বুঝি বা বসন্ত দেখা দেয়। কিন্তু কেহ মনের সন্দেহ মুখে প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না।

মেসের ঝি কাজকর্ম্ম সারিয়া রাত্রে বাসায় চলিয়া যায়। কিন্তু আজ সে বাসায় গেল না. নগেনের ঘরের বারান্দায় শুইয়া রহিল। বাসার ছেলেদের মধ্যে নগেন

সব চেয়ে ছেলেমানুষ। বোধ করি, ঝির তাহার প্রতি একটু কেমন মায়া ছিল।

৫

পরদিন প্রাতে জানা গেল, নগেনের বসন্ত হইয়াছে। মধুচক্রে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে তাহার যেমন অবস্থা হয়, এই দুঃসংবাদে মেসের ছাত্রদলে সেইরূপ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল।

বেলা আটটার সময় যতীনের শ্বশুরবাড়ীর একজন বেড়াইতে আসিয়া শুনিলেন, মেসে এক জনের বসন্ত হইয়াছে। তিনি যতীনকে আর সেখানে রাখিতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা সে তাহার শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল। আর আর সকলেও বাড়ী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

নগেনের এক আত্মীয় হারিসন রোডের একটা মেসে থাকিতেন। তাঁহাকে নগেনের সেবা সুশ্রূষার উপায়-বিধান করিবার জন্য একখানি চিঠি লিখিয়া দিয়া, মেসের ছাত্রগণ, কেহ ইচ্ছায়, কেহ অনিচ্ছায়, কেহ প্রাণের ভয়ে, কেহ অভিভাবকের কড়া হুকুমে, যে যার বাড়ী চলিয়া গেল।

রোগক্লিষ্ট, যন্ত্রণা-বিধুর, মরণভয়ভীত নগেন্দ্রনাথ বন্ধু-

সাজি।

গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, দুরন্ত বসন্ত রোগের কবলে আত্মসমর্পণ করিয়া, মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

রোগের যন্ত্রণা অপেক্ষা এই অসহায় অবস্থা তাহার পক্ষে অধিকতর অবসাদের কারণ হইল। তখন স্নেহ-কিরণসমুজ্জ্বল পল্লীগৃহের কথা তাহার স্মরণপথে প্রতি-ফলিত হইতেছিল,—মধ্যে মধ্যে অশ্রুজলে তাহার বসন্ত-ব্রণকণ্টকিত পাণ্ডু গণ্ডদেশ ভাসিয়া যাইতেছিল।

নগেনের এই অসহায় অবস্থায়, ঝি তাহাকে পরি-ত্যাগ করিল না; ঝির প্রাণের মায়া ছিল কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু নগেনের মায়া সে ছাড়িতে পারিল না। নগেনকে একাকী ফেলিয়া সে বাসায় যাইতে পারিল না। সমস্ত দিন অনাহারে নগেনের সুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিল।

অপরাহ্নের অস্তমান রবিকর নগেনের শয্যায় আসিয়া পড়িল; তাহার নিষ্প্রভ মলিন মুখ ও নিমীলিত নেত্রযুগ রৌদ্রকরে একটু কুঞ্চিত হইল। ঝি উঠিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল। জানালা বন্ধ করিবার শব্দে নগেন একবার চক্ষু চাহিল। ঝিকে বলিল, "তুমি এখনও বসিয়া আছ?"

ঝি বলিল, "সমস্ত দিনটা তুমি অঘোরে ছিলে, আমি কেমন করিয়া তোমায় একলা ফেলিয়া যাই। একটু একলা থাকো বাবা, আমি এই চিঠিখানা দিয়ে আসি।"

নগেন কাতরনয়নে সন্দিগ্ধচিত্তে ঝির মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর তাহার অঞ্চল ধরিয়া বলিল, "সবাই ফেলে চলে গেছে, ঝি, তুমি ফেলে যেও না!" অশ্রু-জলে তাহার উপাধান সিক্ত হইতে লাগিল।

ঝি বলিল, "তোমায় ফেলে আমি কোথাও যাব না বাবা; একবার ছেড়ে দাও, নতুন রাস্তার সেই বাসায় তোমার কে আপনার লোক আছেন,—তাঁহাকে এই চিঠিখানি দিয়া আসি।"

রোগের যন্ত্রণায়, শারীরিক দৌর্ব্বল্যে, মনের উদ্বেগে ও আশঙ্কায়, নগনের প্রতিবাদ করিবারও সাধ্য ছিল না। তাহার মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঝির অঞ্চল মুক্ত হইল। নগেন আবার চক্ষু মুদিয়া পাশ ফিরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

ঝি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিল, "ঠাকুর! রক্ষা কর।" তার পর চিঠিখানি সংগ্রহ করিয়া সে হারিসন রোডের দিকে প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ডাক্তার দাস নগেনকে দেখিতে আসি-লেন। উপরে উঠিয়া তিনি মেসের কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। প্রত্যেক কক্ষে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু জনমানবের সাক্ষাৎ পাইলেন না; তখন তাঁহার মনে হইল, বাসায় বসন্তরোগের আবির্ভাব দেখিয়া ছেলেরা

সাজি।

মেস ছাড়িয়া পলাইয়াছে। কিন্তু বসন্তপীড়িত নগেন্দ্রনাথ কোথায় গেল? তাহাকে হয় ত কোনও আত্মীয়ের আলয়ে বা হাঁসপাতালে পাঠাইয়া থাকিবে।

ডাক্তার দাস ফিরিতেছিলেন; আবার কি মনে হইল —তিনি আবার উপরে উঠিয়া নগেনের ঘরের দিকে চলিলেন।

সেই অন্ধকার কক্ষে, হৃদয়ে তদপেক্ষা অন্ধকার আশঙ্কা সংশয় নিরাশার ভার লইয়া নগেন্দ্রনাথ শয্যার সহিত মিশিয়া পড়িয়া আছে। ডাক্তার বাবু তাহার অবস্থা কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

নগেন চমকিয়া উঠিল; জিজ্ঞাসিল, "কে ও? ঝি?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "না, আমি ডাক্তার।"

নগেন ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "তবে ঝিও চলে গেছে—ডাক্তার ম'শায়, আমার কি হবে?"

ডাক্তার বাবুও অন্যমনে তাহাই ভাবিতেছিলেন।

৬

এমন সময়ে সোপানে কাহার পদশব্দ শ্রুত হইল। ডাক্তার দাস বলিলেন, "কে?"

ঝি নিরুত্তরে নিঃশব্দে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে সেই চিঠি।

ঝি প্রদীপ জ্বালিয়া, ঘরের কোন হইতে একটা

মাটীর দেল্‌কো আনিয়া তাহার উপর প্রদীপটা বসাইয়া, রোগীর শয্যাপার্শ্বে রক্ষা করিল।

নগেন জিজ্ঞাসা করিল, "চরণ বাবু এলেন না?"

ঝি বলিল, "তিনি সে বাসায় নেই। তাঁদের বাসার সকলে চলে গেছে; তিনি কোথায় আছেন, কেউ বল্‌তে পার্‌লে না। আমি পাশের বাসায় সন্ধান নিয়ে আর দুটো তিনটে বাসা খুঁজে আস্‌ছি—কিন্তু তিনি কোথাও নেই।"

ডাক্তার দাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "চরণ বাবু কে?"

নগেন। আমার দূর সম্পর্কের ভগিনীপতি।

ডাক্তার দাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ীতে খবর দেওয়া উচিত। তোমার বাড়ী কোথায়?"

নগেন বলিল, "হরিরামপুর।"

গ্রামের নাম শুনিয়া ঝি যেন একটু চমকিয়া উঠিল; সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল।

ডাক্তার বাবু আবার জিজ্ঞাসিলেন, "কোন্ জেলা? পোষ্ট-আফিসের নাম কি? সেখানে কি টেলিগ্রাফ যায় না?"

নগেন বলিল, "পাবনা। আমাদের গ্রামেই ডাকঘর। টেলিগ্রাফ যায়।"

ঝি আপন মনে বলিতেছিল, "হরিরামপুর—পাবনা!"

সাজি।

ডাক্তার বাবু ঝির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "হরিরাম-পুরে তোমার বাড়ী বুঝি?"

ঝি ডাক্তার বাবুর কথার উত্তর দিল না; বুঝি সে দিকে তাহার কানও ছিল না। সে বিছানার পাশে বসিয়া নগেনের মাথার চুলগুলি সযত্নে কুরিয়া দিতে লাগিল।

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "আমি তোমার বাড়ীতে টেলিগ্রাফ করিয়া দিতেছি। তোমার বাবার নাম?"

নগেন বলিল, "কৃষ্ণকমল ভাদুড়ী।"

কৃষ্ণকমল ভাদুড়ীর নাম শুনিয়া ঝি আবার যেন চকিত হইয়া উঠিল। তাহার পর ডাক্তার বাবুকে বলিল, "ডাক্তার বাবু, টাকার জন্য ভাব্‌বেন না, আমার বাবাকে আপনি ভাল করে দিন। এই তাগা আর দানা বিক্রী কল্লে আন্দাজ দু' শ' টাকা হবে,—তাতে কুলোবে না?"

ডাক্তার দাস বলিলেন, "টাকার জন্য ভাবিতেছি না। দুরন্ত রোগ, তুমি স্ত্রীলোক, একা কি করিবে?"

ঝি বলিল, "তাহার জন্য আপনি ভাবিবেন না;—আমি এখান থেকে নড়িব না। ভদ্রলোকের ছেলে কি বিদেশে এই বিপদে একলা থাক্‌বে?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "হাঁসপাতালে পাঠাইলে সব দিকে সুবিধা হইত।"

হাঁসপাতালের নামে নগেন শিহরিয়া উঠিল। ঝি দৃঢ়স্বরে বলিল, "তাহা হইবে না; আমি কিছুতেই বাছাকে হাঁসপাতালে পাঠাইতে দিব না। আপনি না দেখেন, আমি অন্য ডাক্তার ডাকিয়া আনিব।"

অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর স্থির হইল, নগেন মেসেই থাকিবে। ডাক্তার বাবুর বাড়ী হইতে তাহার পথ্য আসিবে, আর ঝি তাহার পরিচর্য্যা করিবে।

৭

ডাক্তার বাবু নগেনের পিতাকে টেলিগ্রাফ করিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চিঠিও লিখিলেন।

দিনের পর দিন গেল। সপ্তাহ অতীত হইল। ক্রমে পক্ষ পূর্ণ হইল। কিন্তু নগেনের পিতা আসিলেন না। একখানা চিঠিও পাওয়া গেল না। ডাক্তার বাবু বিস্মিত হইলেন; কিন্তু ঝি বিশেষ বিস্ময় প্রকাশ করিল না। সে ক্রমাগত সেই পোড়ারমুখো বুড়োকে গালি দিতে লাগিল।

ঝির নিদ্রা দূরে থাক্, তন্দ্রাও ছিল না। রাত্রিদিন রোগীর শিয়রে বসিয়া নগেনের সুশ্রূষা করিতে লাগিল। অনবরত ব্যজন করিয়াও তাহার হস্ত অবসন্ন হইত না; বসিয়া বসিয়া তাহার ক্লান্তি জন্মিত না। বসন্তের পূয় রক্ত স্বয়ং অতিসন্তর্পণে পরিষ্কার করিত, তাহাতে তাহার

ঘৃণা ছিল না। বোধ করি, মাও পেটের ছেলের জন্য এতটা করিতে পারিতেন না।

ডাক্তার বাবু নিরক্ষর দাসীর এই অপূর্ব্ব পরার্থপরতা দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিলেন, শেষে মুগ্ধ হইলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতেন, এ মানবী না দেবী?

এইরূপে প্রায় তিন সপ্তাহ অতিবাহিত হইল। যমের সহিত যুদ্ধ করিয়া ডাক্তার বাবু নগেনকে কাড়িয়া লইলেন। ঝি যখন শুনিল যে, নগেন নিরাপদ হইয়াছে, তখন আর তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। সে ডাক্তার বাবুর পদতলে পড়িয়া চক্ষের জলে তাঁহার পাদুকা ধৌত করিয়া দিল।

৮

নগেন ডাক্তার বাবুকে বলিয়াছিল, তাহাদের গ্রামেই পোষ্ট-আফিস আছে। তিনি তদনুসারে সেই ঠিকানায় নগেনের পিতাকে সংবাদ দিয়াছিলেন। টেলিগ্রাফ আফিস বহু দূরে;—সেখান হইতে পিয়ন আসিয়া টেলিগ্রাফ বিলি করিয়া যায়। যখন টেলিগ্রাফ আসে, নগেনের পিতা তখন গ্রামান্তরে ছিলেন। পিয়ন আসিয়া টেলিগ্রাফখানি কৃষ্ণকমল ভাদুড়ীর চাকরের হাতে দিয়া গেল। চাকর সেখানি চালের বাতায় গুঁজিয়া রাখিয়া পুনরায় গরুর

সেবায় প্রবৃত্ত হইল। তাহার পর আর তাহার খেয়াল হইল না।

চিঠিখানি যথাসময়ে ভাদুড়ী মহাশয়ের বাড়ীতে পঁহুছিল বটে, কিন্তু সেখানিও গৃহিণীর হাতে পড়িয়া টেলিগ্রাফের দশা প্রাপ্ত হইল। প্রভেদের মধ্যে, টেলিগ্রাফখানি চণ্ডী-মণ্ডপের, আর চিঠিখানি রান্নাঘরের, চালের বাতায় বিরাজ করিতে লাগিল।

আট দশ দিন পরে কৃষ্ণকমল ভাদুড়ী বাড়ী ফিরি-লেন। তাহার দুই দিন পরে ভাদুড়ীর জামাতার এক-খানি পত্র আসিল। কর্ত্তা সেই পত্রহস্তে গৃহিণীকে কন্যার সংবাদ দিতে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। কর্ত্তার করতলস্থ পত্র দেখিয়া গৃহিণীর মনে পড়িল, আর একখানা চিঠি চালের বাতায় গোঁজা আছে। তখন তিনি সেই ধূম-ধূসরিত পত্রখানি বাহির করিয়া কর্ত্তার হাতে দিলেন। কর্ত্তা চিঠিখানি খুলিয়া পড়িতে পড়িতে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

৯

যে দিন কৃষ্ণকমল ভাদুড়ী কলিকাতায় পঁহুছিলেন, তাহার পূর্ব্ব দিন ঝি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিল। ডাক্তার বাবু বুঝিলেন, বসন্তরোগীর সেবা করিয়া ঝি বসন্তের

বিষে আক্রান্ত হইয়াছে। পর দিন ডাক্তার বাবুর সংশয় সত্যে পরিণত হইল।

নগেন তখনও শয্যাগত। বৃদ্ধ পিতা প্রাণপণে তাহার সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। সে তবু বারবার প্রশ্ন করিতে লাগিল, "ঝি কোথায়?"

বৃদ্ধের পক্ষে ঝির সেবা সুশ্রূষা সম্ভব নহে। তিনি নিজের রুগ্ন পুত্র লইয়াই বিব্রত। বিশেষতঃ, দেশে নগেনের মা দুশ্চিন্তায় মৃতপ্রায় হইয়া আছেন। নগেন আর একটু সারিয়া উঠিলে কর্ত্তা তাহাকে লইয়া দেশে ফিরিবেন। নগেন জানিত, ঝির জর হইয়াছে। সে মধ্যে মধ্যে ঝিকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইত। বৃদ্ধ তাহাকে বিবিধ স্তোকবাক্যে নিরস্ত করিতেন।

ঝিকে লইয়া বৃদ্ধ বিষম সমস্যায় পড়িলেন। ঝির প্রাণপণ যত্নেই পুত্র প্রাণ পাইয়াছে, তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। এ অবস্থায় তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইতে তিনি স্বভাবতঃ একটু কুণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু নিজেও বসন্তের মত সংক্রামক রোগের সংস্পর্শে যাইতে পারেন না। আর, তাঁহার পক্ষে কলিকাতায় থাকাও সম্ভবপর নহে। দুই বেলা হাত পোড়াইয়া রাঁধিয়া খাইতে হয়, রুগ্ন পুত্রের পথ্য যোগাইতেই প্রাণান্ত, কি করিয়াই বা কলিকাতায় থাকেন। সুবিধা ও সুপ্রবৃত্তি,

উভয়ের সংগ্রামে, শেষে সুবিধারই জয় হইল। বৃদ্ধ ঝিকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, যদি বাঁচে, তাহাকে আর দাসীবৃত্তি করিতে দিবেন না।

১০

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "এখন আপনি নগেনকে দেশে লইয়া যাইতে পারেন।"

নগেন শুনিয়া বলিল, "ঝি কই?"

তখন নগেনকে সব কথা খুলিয়া বলিতে হইল।

শুনিয়া নগেন অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল; তাহার পর কিয়ৎক্ষণ বৃদ্ধ পিতার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। সে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলিতে পারিল না;—কেবল তাহার শীর্ণ, জীর্ণ, বসন্তদীর্ণ গণ্ডদ্বয় সিক্ত করিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

নগেন বলিল, "ঝিকে না দেখিয়া আমি কখনও বাড়ী যাইব না।"

পুত্রের বাক্যহীন তিরস্কারে বৃদ্ধ অত্যন্ত মর্ম্মাহত, সঙ্কুচিত, লজ্জিত হইয়াছিলেন। আপনার নিকট আপনাকে অপরাধী মনে করিতেছিলেন। বার্দ্ধক্য আপনার গণ্ডা বেশী মাত্রায় বুঝিয়া লয় বটে, কিন্তু সরল নিঃস্বার্থ ভাবের নিকট সেও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

দুর্ব্বল রুগ্ন পুত্রকে সংক্রামক রোগের বীজে পূর্ণ

সাজি।

হাঁসপাতালে লইয়া যাইতে বৃদ্ধের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু নগেন কিছুতেই নিরস্ত হইল না। অগত্যা বৃদ্ধ তাহাকে লইয়া হাঁসপাতালের দিকে যাত্রা করিলেন।

১১

অনেক কষ্টে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া বৃদ্ধ ও নগেন বসন্তরোগীর ওয়ার্ডে প্রবেশ করিলেন।

ঝির আর বাঁচিবার আশা ছিল না। তাহার দেহ অবসন্ন, জীবনীশক্তিশূন্য হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু তখনও তাহার জ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

নগেন তাহার শয্যাপার্শে দাঁড়াইয়া ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "ঝি! কেমন আছ?"

ঝি চোখ তুলিয়া চাহিল; তাহার মরণছায়ামলিন মুখে অপূর্ব্ব আনন্দভাতি প্রতিভাসিত হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি এখানে কেন, তুমি যাও,—একবার তোমাকে যমের মুখ হইতে টানিয়া আনিয়াছি—"

নগেন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তুমি আমার প্রাণ দিয়াছ, আমার রোগ আপনি লইয়াছ;—আমার জন্যই—"

ঝি নগেনের কথা সমাপ্ত হইতে দিল না। তাহার কোটরগত চক্ষে অপূর্ব্ব জ্যোতি, রোগশীর্ণ মুখে স্বর্গীয় দীপ্তি;—সে নগেনকে বলিল, "তুমি চিরজীবী হও বাবা;—আমার মরিবার বয়স হইয়াছে,—মরিতে দুঃখ নাই।

অসময়ে ভগবান্ যে আমাকে তোমার সেবা করিতে দিয়াছেন, সেই আমার ভাগ্য।—তোমার বাবাকে বলো—"

নগেন বলিল, "বাবাও তোমাকে দেখিতে আসিয়াছেন। বাবা!"

বৃদ্ধ কৃষ্ণকমল ভাদুড়ী কুণ্ঠিতভাবে সন্নিহিত হইলেন। তাঁহার মনে তখন অনুশোচনার উদয় হইতেছিল। হয় ত অযত্নে এই দয়াবতী নারীর প্রাণ গেল;—হয় ত গৃহে রাখিয়া চিকিৎসা করাইলে তিনি পুত্রের প্রাণদাত্রীর প্রাণরক্ষা করিতে পারিতেন। অপরাধীর মত জড়িতকণ্ঠে বলিলেন, "আমি এ জীবনে তোমার ধার শুধিতে পারিব না।—তোমার কোন্ দেশে বাড়ী, সেখানে তোমার কে আছে বল,—কাহাকে দেখিতে চাও—বল, আমি তোমার কোনও ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিব না।"

ঝি একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার পর অতিকষ্টে ক্ষতপূর্ণ করদ্বয়ে অঞ্জলি রচনা করিয়া বৃদ্ধকে প্রণাম করিল; তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "ঠাকুর, আমাকে চিনিতে পারেন কি?"

বৃদ্ধ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু সেই ব্রণক্ষত মুখ তাঁহার পরিচিত বলিয়া বোধ হইল না। মনে কৌতূহল না উদ্বেগ, কোন্‌টার প্রবাহ অধিক, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "না!"

সাজি।

ঝি বলিল, "আমার নাম বামা। আজ কুড়ি বৎসর হইল, আপনি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন। বিধবার সর্ব্বনাশ করিয়াও আপনার তৃপ্তি হয় নাই, তাই আমার বুক-চেরা ধন আপনি নষ্ট করিয়াছিলেন, সে কথা মনে পড়ে কি?"

বৃদ্ধ নীরবে ভূতলে দৃষ্টি সন্নদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। যেন ভূতলে তিনি অতীত-কাহিনী চিত্রিত দেখিতেছিলেন।

ঝি একটু চেষ্টা করিয়া আবার বলিল, "আপনার মান বাঁচাইবার জন্য দুঃখিনীর ছেলে নষ্ট করিয়া আপনি আমাকে দেশছাড়া করিয়াছিলেন। আজ আমি আপনার ছেলে আপনার কোলে দিয়া চলিলাম! আমাকে দুটি পায়ের ধূলো দিন।"

স্তম্ভিত বজ্রাহত পুত্র ও চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চল নির্ব্বাক নিঃস্পন্দ পিতার সম্মুখে বামার পার্থিব যাতনার অবসান হইল।

তীর্থের পথে

তীর্থের পথে।

১

মহামায়া বলিল, "তুমি মর!"

যোগমায়া বলিল, "আমি ত অনেকদিন মরিয়াছি। আজ তোর কথায় নূতন করিয়া মরিতে পারিব না।"

মহামায়া বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা। সে তাহার স্বামী রামদয়াল ঘোষালের সহিত রুগ্ন পিতাকে দেখিতে আসিয়াছিল।

যোগমায়া বিশ্বেশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্রী। সে বিধবা। বিশ্বেশ্বরের পরিবারে থাকিয়াই সে ব্রহ্মচর্য্যপালন করিতেছিল।

মহামায়ার বয়স উনিশ, যোগমায়া তাহার অপেক্ষা তিন্ বৎসরের বড় হইবে। মহামায়া সুন্দরী, যৌবনের উচ্ছলিত তরঙ্গে তাহার রূপরাশি তরঙ্গিত হইতেছিল। মহামায়ার রূপের গাঙ্গে ভরা জোয়ার। আর বালবিধবা যোগমায়াকে রূপসী বলিলে হয় ত সঙ্গত হইবে না। কিন্তু তাহার চঞ্চল নয়নের দিকে চাহিলে দৃষ্টি সহজে ফিরিতে চাহিত না। যোগমায়ার যৌবনে এখনও ভাঁটা

সাজি।

পড়ে নাই। কিন্তু মহামায়ার মত তাহার ভরা জোয়ারও নয়; বরং তটপ্লাবিনী খর-বাহিনী বন্যার সহিত তাহার অধিকতর সাদৃশ্য ছিল।

আকৃতির ন্যায় উভয়ের প্রকৃতিও অত্যন্ত বিভিন্ন ছিল। মহামায়া গম্ভীর, স্থির, ধীর, আপনাতে আপনি নিমগ্ন। যোগমায়া চঞ্চল, অস্থির, অধীর, আপনার বিফলতায় আপনি অসন্তুষ্ট। বৈধব্যচিহ্নের সহিত, তাহার রূপের সহিত, এই চাঞ্চল্য শোভা পাইত না। পক্ষান্তরে মহামায়ার সৌন্দর্য্য যেন এই যৌবন-সুলভ চাঞ্চল্যের অভাবে প্রাণ-হীন হইয়া থাকিত। মহামায়ার সৌন্দর্য্য মলিন; যোগ-মায়ার রূপেও বিশেষত্ব ছিল না। কিন্তু হৃদয়ের কোনও আবেগ, উচ্ছ্বাস যখন সহসা যোগমায়ার মুখে প্রতিবিম্বিত হইত, তখন তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে সূর্য্যকরসমুজ্জ্বল শিশির-বিন্দুর মত মনোহর শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।

দুই ভগিনীতে কথা হইতেছিল। মহামায়া স্থির, অচঞ্চল। অপরা অস্থির, চঞ্চল,—সমীরসংক্ষুব্ধ তটিনীর মত আপনার চাঞ্চল্যে আপনি কম্পিত তরঙ্গিত হইতেছিল।

মহামায়া বলিল, "আমার জন্য বলিতেছি না; এখনও বুঝিয়া দেখ।"

যোগমায়া বলিল, "আমি তোমার নিধি কাড়িয়া লইব না!"

মহামায়ার মুখে তাহার হৃদয়ভাব অনুসন্ধান করিলে কেহ বুঝিতে পারিত না, সে ক্রুদ্ধ, বিষণ্ণ, না বিরক্ত। কিন্তু যোগমায়ার হাস্যকিরণদীপ্ত মুখে চোখে কৌতুক উচ্ছলিত হইতেছিল।

যোগমায়া বলিল, "তুই সাবধানে পাহারা দিস, নহিলে আমি চুরি করিব।"

মহামায়া বলিল, "চুরি করিয়া কোথায় বমাল রাখিবি? আমার জিনিস আমারই থাকিবে, তোর অদৃষ্টে কেবল চোর অপবাদ—"

যোগমায়া বলিল, "সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে।"

অদূরে কাহার পদশব্দ শুনিয়া যোগমায়া চাহিয়া দেখিল, রামদয়াল সেই দিকে আসিতেছেন। সে ছুটিয়া পলাইল।

রামদয়াল সন্নিহিত হইলে মহামায়া বলিল, "তুমি বাড়ী যাও।" রামদয়াল দেখিল, মেঘমেদুর অম্বরে সন্ধ্যার অন্ধকারের মত মহামায়ার গম্ভীর মুখে কিসের ছায়া;— তাহা উদ্বেগের না আশঙ্কার, তাহা সে ভাল বুঝিতে পারিল না। কখনও সে তা পারিত না। রামদয়াল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

মহামায়া বলিল, "দু' জনে ঘরসংসার ছাড়িয়া কত

দিন এখানে থাকিব? বাবাকে ফেলিয়া আমি ত যাইতে পারিব না, তুমি যাও।"

রামদয়াল বলিল, "তা কি হয়? তোমাকে রাখিয়া রুগ্ন শ্বশুরকে ফেলিয়া চলিয়া গেলে লোকে কি বলিবে?"

মহামায়ার মুখে চোখে একটু হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। সে হাসি শরতের শুভ্র মেঘের বিদ্যুতের মত ক্ষণিক ও ক্ষীণ, কিন্তু বর্ষার বিদ্যুতের মত তীব্র। রামদয়াল কিছু বুঝিতে পারিল না। সে গত কয়েক দিবস হইতে কেমন অন্যমনস্ক হইয়াছিল, আপনাকে আপনি বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার উপর, মহামায়ার এই প্রহেলিকা দেখিয়া একটু অবাক হইয়া আবার অন্যমনস্ক হইতেছিল। এমন সময়ে মহামায়ার কণ্ঠ শুনিয়া সে চকিত হইয়া উঠিল।

মহামায়ার কণ্ঠে উচ্চারিত হইতেছিল, "লোকে কি বলিবে—তাই ভাবিয়া ত তোমার ঘুম হয় না; যোগমায়া কি বলিবে,—তাই—"

ঘটঘটনাচ্ছন্ন দুর্য্যোগে ঘোর নিশীথের গাঢ় অন্ধকারে মুক্ত প্রান্তরে দূরে সহসা বজ্রপাত হইলে পথিক যেমন বজ্রশব্দে চমকিয়া উঠে, আর চপলার চকিত আলোকে পলকের মধ্যে তাহার উদ্‌ভ্রান্ত নয়নের সমক্ষে এক মুহূর্ত্তের জন্য প্রলয়ঙ্করী প্রকৃতির মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হয়,

মহামায়ার এই ক'টি কথা শুনিয়া রামদয়াল তেমনই চকিত হইয়া উঠিল, মহামায়ার কণ্ঠোচ্চারিত যোগমায়ার নামে সহসা তাহার জীবনপথের সম্মুখে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব অস্পষ্ট ছবির আভাস দেখিতে পাইল!

রামদয়াল আত্মস্থ হইবার পূর্ব্বেই মহামায়া সে স্থান ত্যাগ করিয়াছিল। রামদয়াল চাহিয়া দেখিল, মহামায়া দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহার চর্ম্মচক্ষুর উপর এই প্রকৃত দৃশ্য বিদ্যমান থাকিলেও ইন্দ্রজালমুগ্ধের ন্যায় সে আর এক নূতন ছবি দেখিতেছিল! তাহাকে আসিতে দেখিয়া যোগমায়া যখন ছুটিয়া পলায়, তখন রামদয়াল তাহা দেখিয়াও দেখে নাই; ইহাও সম্পূর্ণ সত্য, তাহা যে দেখিবার মত, তাহাও রামদয়ালের মনে হয় নাই। কিন্তু এখন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, পলায়মানা অসম্বৃতকেশবাসা যোগমায়ার চিরপরিচিত মূর্ত্তি নিতান্ত নবপরিচিতের মত, নিত্যনূতনের মত, তাহার নয়নপটে অনবরত প্রতিবিম্বিত হইয়া তাহাকে আকর্ষণ করিতেছিল।

২

রামদয়াল, ইতিপূর্ব্বে, মহামায়ার সহিত এই সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই, এখন তাহা নিতান্ত কঠোর সত্যে পরিণত হইল।

সাজি।

মহামায়ার চিরপরিচিত কণ্ঠস্বরে জাগিয়া সে দেখিল, তাহার হৃদয়ের সিংহাসন শূন্য, সেখানে মহামায়া নাই। আর এক জন বিনা আহ্বানে, অজ্ঞাতসারে, মহামায়ার শূন্য সিংহাসন কখন অধিকার করিয়াছে। সে বিস্মিত বিরক্ত বিচলিত হইল বটে, কিন্তু কি করিবে, স্থির করিতে পারিল না।

একবার মনে করিল, চলিয়া যাই। কিন্তু তাহা সঙ্গত মনে হইল না। পীড়িত শ্বশুরকে ত্যাগ করিয়া যাইতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। বৃদ্ধের আর কেহ ছিল না; বিষয়আশয়ের কি বন্দোবস্ত হয়, তাহাও দ্রষ্টব্য বটে।

কিন্তু এ দিকে? রামদয়াল ভাবিল, এ হয় ত স্বপ্ন। এ হয় ত ক্ষণিক। এই মরীচিকায় আমি কি সত্যই মুগ্ধ হইব?

রামদয়াল আপনার মনে আপনার মনের মত বিবিধ যুক্তির রচনা করিল। শেষে সিদ্ধান্ত করিল, এক দিকে সম্ভাবনা, অন্য দিকে কর্ত্তব্য। সম্ভাবনার ভয়ে কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিব কেন? মন কি এত লঘু? জীবন কি এত অসার? সংযম কি এত কঠোর? মানসিক ব্যাধি কি এত দুঃসাধ্য? তাই যদি হয়, আজ না হয় পলাইয়া বাঁচিলাম; কাল? পৃথিবীতে কোথায় প্রলোভন নাই? কোথায় গিয়া নিশ্চিন্ত হইব?

এই সব তর্কজালের অন্তরালে যে যোগমায়া লুকাইয়াছিল; তাহার কামনা, তাহার দর্শনলালসাই যে রামদয়ালের কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে এতটা উৎসাহিত করিতেছিল; যে আত্মসংযমের ভরসায় নির্ভর করিয়া সে আত্মজয়ের আশা করিতেছিল, তাহাই যে অসংযমের নামান্তর; তাহা রামদয়াল বুঝিতে পারিল না।

মহামায়া বুঝিল, কিন্তু উপায় ছিল না। যোগমায়া বুঝিল, কিন্তু ফিরিতে পারিল না। রামদয়াল বুঝিয়াও বুঝিল না, আপনাকে আপনি বঞ্চনা করিল। ফলে কিন্তু মরিল মহামায়া।

মুমূর্ষুর অন্তিম-শয্যায়, মৃত্যুচ্ছায়ার আলো-আঁধারে, পরস্পরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া তিন জনের কেহ অবসন্ন হইত না। আশায় নিরাশায়, সংশয়ে যাতনায়, শঙ্কায় ভাবনায় তিন জনের হৃদয় মথিত হইতেছিল; তিন জনেই নীরবে স্রোতে ভাসিয়া চলিল, কেহ আর কিছু ভাবিল না।

৩

যোগমায়ার চঞ্চলতা কোথায় গেল? তাহার কামনা-পূর্ণ হৃদয় এখন নিস্তরঙ্গ। সেই চঞ্চল নয়ন এখন প্রশান্ত, তাহাতে আর কৌতুকের রশ্মি নাই। সে হাস্যদ্যুতি কোথায় অন্তর্হিত হইল? অতৃপ্তির চাঞ্চল্য গেল, কিন্তু

সাজি।

তৃপ্তির সে সান্ত্বনা, সে শান্তি কই? তবু এই পরিবর্ত্তনে যোগমায়া যেন সম্পূর্ণতা লাভ করিল।

মহামায়াও স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য্য হারাইল। তাহার সৌন্দর্য্যের সহিত গাম্ভীর্য্যের যে অসঙ্গতি ছিল, তাহা দূর হইল। মহামায়া এখন প্রায় হাসে, সময়ে সময়ে হাসিয়া আকুল হয়, কেন? জীবনের পরিপূর্ণ তৃপ্তি হারাইয়া সে চঞ্চল হইতেছিল। জীবনের নিষ্ঠুরতায় দলিত পিষ্ট ব্যথিত হইয়াও সে প্রতিজ্ঞা করিল, সুখ যায় যাক, শান্তি ছাড়িব না।

আপনার ঘর পুড়িতে দেখিয়া যে নিকটে দাঁড়াইয়া হাসে, সে জানে, দু' দশ কলসী জলে এ আগুন নিভিবে না! তবু না কাঁদিয়া সে হাসে কেন? হায় বিড়ম্বনা!

৪

এক দিন মুমূর্ষু পিতার শিয়রে বসিয়া মহামায়া ঢুলিতেছিল।—আর জাগিয়া থাকিতে পারে না। মনে করিল, হয় রামদয়ালকে নয় যোগমায়াকে ডাকিয়া দিয়া নিজে একটু ঘুমাইবে। মহামায়া ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় গেল। রামদয়ালের ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিল, গৃহমধ্যে অন্ধকার। কথোপকথনের মৃদু অস্পষ্ট

শব্দ মহামায়ার কানে আসিতেছিল। নীরবে দ্বারে হাত দিল। বুঝিল, দ্বার মুক্ত। দরজা একটু মুক্ত করিয়া দেখিল, ঘোর অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ক্রমে সেই অন্ধকারে দেখিল, গৃহমধ্যে যোগমায়া ও রামদয়াল। মহামায়া না দেখিলেও তাহা বুঝিতে পারিত। তবু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল। সেই গাঢ় অন্ধকার তাহার চক্ষে গাঢ়তম হইয়া আসিতেছিল। অনেক কষ্টে সে আত্মসংবরণ করিবার চেষ্টা করিল। তাহার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। মহামায়া দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিল। সহসা মহামায়ার অজ্ঞাতসারে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, "বেশ!"

গৃহমধ্যে কণ্ঠস্বর নীরব হইল। মহামায়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া পিতার শয্যাতলে আসিয়া বসিল। তাহার শিরায় শিরায় আগুন জ্বলিতেছিল;—নয়নের সমস্ত অশ্রু ঢালিয়াও তাহার জ্বালা ভুলিতে পারিল না।

মহামায়া সুপ্ত না জাগরিত, তাহা আপনিই বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার একবার মনে হইল, সোপানে কাহার পদশব্দ! তাহার পর যেন শুনিতে পাইল, কে ধীরে ধীরে সদর-দরজা উন্মুক্ত করিল! সে স্বপ্নোত্থিতের মত উঠিয়া বসিল; ধীরে ধীরে প্রদীপ হইতে একটি

সাজি।

শলিতা জ্বালিয়া লইয়া পার্শ্বের গৃহের দ্বারে গিয়া দেখিল, দ্বার মুক্ত। কম্পিতহস্তে শলিতাটি ধরিয়া ভিতরে চাহিল, সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। মন্ত্রমুগ্ধের মত সোপানমূলে আসিয়া দাঁড়াইল; এই সময়ে তমোময়ী যামিনীর দীর্ঘনিশ্বাসের মত সহসাগত পবনবেগে শলিতাটি নিভিয়া গেল। অন্ধকারে প্রাচীর ধরিয়া সে নীচে নামিল;—অন্ধকারে বাহির-দরজার দিকে যাইতে লাগিল। একটু অগ্রসর হইয়া দেখিল, সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া উন্মুক্ত-দ্বারপথে একাদশীর চন্দ্রালোক প্রবেশ করিয়াছে, সম্মুখে অনন্তপ্রসারিত নক্ষত্রভূষিত গগনের কিয়দংশ, আর তাহার নিম্নে আলোক ও আঁধারে অস্পষ্ট গ্রামপথ।

মহামায়া আর দাঁড়াইতে পারিল না, ছিন্ন ব্রততীর ন্যায় ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

একবার মনে করিল, এ যাতনা সহি কেন? মরিলে ত জুড়াইতে পারি। কিন্তু তাহা হইলে পীড়িত পিতার কি হইবে? আবার ভাবিল, আর একবার না দেখিয়া মরিব? কিন্তু আর কি দেখা পাব?

তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল,—কৃতাঞ্জলি হইয়া ঊর্দ্ধমুখে কহিল, "যাও,—মরিবার আগে আর একবার তোমায় দেখিতে ইচ্ছা করে!"

৫

এগার বৎসর অতীত হইয়াছে। স্বামিপরিত্যক্তা পিতৃহীনা মহামায়া এই কয় বৎসর শোকে দগ্ধ ও দুঃখে জীর্ণ হইয়াও বাঁচিয়া আছে। সংসারে তাহার কোনও অবলম্বন ছিল না, বন্ধন ছিল না। কেবল এক আশাবৃন্তে তাহার জীবনকুসুম সন্নদ্ধ হইয়াছিল ;—মরিবার আগে অভাগীর অদৃষ্টে কি একবার তাঁহার চরণ-দর্শন ঘটিবে না ?

এই সময়ে গ্রামে এক জন পুরুষোত্তমের সেথো উপস্থিত হইল। গ্রামে গ্রামে কোলাহল পড়িয়া গেল। সন্নিহিত সাত আটখানি গ্রামের নরনারী মিলিয়া পুরুষোত্তমতীর্থে দারুব্রহ্ম-দর্শনে যাত্রা করিল।

মহামায়াও তাহাদের সঙ্গী হইল। মনে মনে ভাবিল, তাঁহার দর্শন পাইলাম না, ঠাকুরের চরণ পাইব কি ?

৬

দূর পথ। যাত্রীর দল পদব্রজে যাত্রা করিল। ক্রমে তাহারা মেদিনীপুর পার হইয়া উৎকলের সীমায় প্রবেশ করিল।

যাত্রার দশ দিন পরে যাত্রীর দল একটি চটীতে উপস্থিত হইল। রথের যাত্রী চলিয়াছে ; পথে জনতার সংখ্যা হয় না। মহামায়ার গ্রামস্থ যাত্রীর দল যখন রাসপুরের চটীতে পঁহুছিল, তখন সেখানে বিসূচিকা বড়

সাজি।

প্রবল। তীর্থযাত্রীর মৃতদেহে ক্ষুদ্র গ্রাম পরিপূর্ণ। পথের ধারে, প্রান্তরে, বৃক্ষতলে, সরোবরতীরে, সর্ব্বত্র মৃতদেহ। কেহ বা অর্দ্ধমৃত, সঙ্গীরা ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। এ পথে কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না। দলের কেহ পীড়িত হইলে ফেলিয়া রাখিয়া যায়। পরিত্যক্ত হতভাগ্য অভীষ্ট তীর্থের পথেই পরম ও চরম তীর্থে চলিয়া যায়।

চটীতে স্থানাভাব। অনেক কষ্টে সন্ধ্যার পর একটি দোকানে মহামায়ার দলস্থ সকলে আশ্রয় লইলেন।

সেই দিন মধ্যরাত্রে সেই দোকানে পূর্ব্বাগত যাত্রীর দলের এক জন পুরুষ বিসূচিকায় আক্রান্ত হইল। মহামায়ার গ্রামের দল ভয়ে চটী পরিত্যাগ করিয়া সেই রাত্রেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল।

সকলে বাহিরে সমবেত হইলে দেখা গেল, মহামায়া দলে নাই।

বৃদ্ধ রামহরি চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, "মহামায়া কই? মহামায়া!"

এক জন বলিল,—"সে চটীতে পড়িয়া আছে, তাহার উঠিবার শক্তি নাই। তাহাকেও রোগে ধরিয়াছে।"

এ পথের এই দস্তুর। কোন্ পথেই বা নয়?

আপনাকে বিপন্ন করিয়া কে পরের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিবে? যাত্রীর দল চলিয়া গেল। মহামায়া একাকিনী, অসহায়া, মরণাহতা, সেই চটীতে পড়িয়া রহিল।

চটীর এক প্রান্তে মহামায়া ও অন্য প্রান্তে অপর দলের সেই রুগ্ন যাত্রী—উভয়েরই জীবনবন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছিল। মহামায়াকে দেখিবার কেহ ছিল না, কিন্তু এক বর্ষীয়সী রমণী রোগাক্রান্ত পুরুষের সুশ্রূ-ষায় নিরত ছিল। অপরিচিতার কি প্রাণের ভয় নাই? অথবা যে মৃত্যুশয্যায়, সে ইহার প্রাণাধিক?

মহামায়া যাতনায় অস্থির হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার কাতর স্বরে আকৃষ্ট হইয়া অপরি-চিতা প্রদীপহস্তে তাহার শয্যাপার্শ্বে উপনীত হইল, মহা-মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে পার্শ্বে বসিয়া বলিল, "তোমার অদৃষ্টে জগন্নাথ-দর্শন নাই।"

মহামায়া বলিল, "তাহাতে দুঃখ নাই। মরণেও দুঃখ নাই। কিন্তু তাঁহাকে না দেখিয়া—"

অপরিচিতা বলিল—"কাহাকে? মরণেও যদি দুঃখ নাই, তবে তোমার এ দুঃখ কিসের?"

"বড় আশায় বুক বাঁধিয়াছিলাম, মরিবার আগে

তাঁহার পদধূলি লইয়া মরিব। মরি, তাতে দুঃখ নাই। তাঁহাকে দেখিয়া মরিলাম কই?”

অপরিচিতা প্রদীপ রাখিয়া মহামায়াকে তুলিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। তখন সে মহামায়ার শয্যা ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

মহামায়া মনে করিল, এই শেষ;—বাহিরে ফেলিয়া দিতে যাইতেছে।

সেই গৃহের অপর প্রান্তে, আর একজন মুমূর্ষুর শয্যা-পার্শ্বে মহামায়ার শয্যা রাখিয়া, অপরিচিতা প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া দিল। তাহার পর মহামায়াকে বলিল, “দেখ!”

মহামায়া কাতরকণ্ঠে বলিল, “কি?”

সে বলিল, “তোমার স্বামী।”

মহামায়া চমকিয়া উঠিয়া বসিতে গেল, পারিল না। আবার শয্যায় পড়িয়া সবিস্ময়ে সাগ্রহে বলিল, “সে কি?”

অপরিচিতা কহিল, “তোমার স্বামী রামদয়াল ঐ মৃত্যুশয্যায়। দেখ।”

মহামায়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, “আমি যে আর দেখিতে পাই না,—দেখাও, দেখাও,—তুমি কে?”

অপরিচিতা মহামায়াকে তুলিয়া ধরিয়া কহিল,—“দেখ! তোমার স্বামীকে দেখ—আমি যোগমায়া—”

মহামায়া চীৎকার করিয়া উঠিল;—যোগমায়া পাষাণ-

প্রতিমার ন্যায় অবিচল। সে মহামায়াকে শয্যায় শায়িত করিয়া মুখে চোখে জল দিতে লাগিল।

মহামায়া একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "তাঁর পদ-ধূলি দাও, মরিবার আগে দাও দিদি, আমি সুখে মরি।"

যোগমায়া মুমূর্ষু রামদয়ালের পদধূলি আনিয়া তাহার মাথায় দিল।

রামদয়াল জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?—কে ?"

মহামায়ার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, নয়নদ্বয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতেছিল। ইঙ্গিতে বুঝাইল, রামদয়া-লের শয্যার কাছে লইয়া যাও।

যোগমায়া তাহার শয্যা আরও নিকটে টানিয়া আনিল,—মুমূর্ষুকে বলিল,—"চিনিতে পার ? মহামায়া—"

রোগী একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। রোগী হস্ত প্রসারিত করিল। যোগমায়া মহামায়ার শীতল হাতখানি লইয়া মুমূর্ষুর শীতল হস্তে সমর্পণ করিল। উভয়ে উভয়ের হাত ধরিয়া অনন্ত পথে যাত্রা করিল।

তাহার পর বহুকাল সেই চটীর পথের ধারে একটা পাগলী বেড়াইত। তাহার মুখে আর অন্য কথা ছিল

সাজি।

না, যাত্রীর দল সবিস্ময়ে শুনিত,—পাগলী বিড় বিড় করিয়া বকিতেছে, "বড় সুখ! বড় সুখ!"

শোকবিজয়

শোকবিজয়।

১

প্রাচীন শ্রাবস্তী নগরে, এক জন ধনবান্ কৃপণ বাস করিত। সে প্রাণপণে অর্থোপার্জ্জন করিয়া অশেষ ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছিল। কৃপণের ধনভাণ্ডার অপরিমিত ধনরত্নে পূর্ণ ছিল বটে, কিন্তু তথাপি তাহার ধনতৃষ্ণার শান্তি হয় নাই। ঐশ্বর্য্যভোগে তাহার প্রবৃত্তি ছিল না, কেবল ঐশ্বর্য্যসঞ্চয়ই তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। কৃপণের অপরিমিত ধনরত্নের সদ্ব্যয়ে কখনও কোনও দরিদ্রের দারিদ্র্যদুঃখ অণুমাত্রও নিবারিত হয় নাই।

শ্রাবস্তীর কৃপণ ধনী এত দিন যে অর্থ দেখিয়া জীবনধারণ করিতেছিল, যে অর্থরাশি তাহার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর ছিল, একদিন অকস্মাৎ সেই অর্থরাশি অঙ্গারে পরিণত হইয়া গেল। যে স্বর্ণ ও রৌপ্যরাশির সমুজ্জ্বল প্রভায় কৃপণের সঙ্কীর্ণ হৃদয় আলোকিত ছিল, সে প্রভা সহসা অন্তর্হিত হইল। অঙ্গারের কৃষ্ণকান্তি তাহার অন্ধতমসময় হৃদয়ের অন্ধকার আরও গাঢ়তর করিতে লাগিল। ধনের শোকে, কৃপণের জীবন শূন্য ও জগৎ জীর্ণ অরণ্যের

সাজি।

ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ক্রমে সে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিল।

কৃপণের বন্ধুগণ তাহার এই অবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা সান্ত্বনাচ্ছলে বলিলেন, "তুমি ধনের জন্য দুঃখ করিতেছ কেন? তোমার অগাধ ঐশ্বর্য্য অঙ্গারের ন্যায় অকর্ম্মণ্য ছিল; কখনও এক কপর্দ্দক দান করিয়াও কাহারও দুঃখ দূর কর নাই; কখনও তুমি অর্থ ব্যয় কর নাই, কখনও তোমার অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই; অতএব, অকর্ম্মণ্য অর্থের জন্য রোদন করিতেছ কেন? তোমার অপরিমিত ধনরাশি অঙ্গারে পরিণত হইয়াছে যথার্থ বটে, কিন্তু সাধুগণের চক্ষে তাহা এখনও অর্থরূপে প্রতীয়-মান হইবে। তুমি ঐ অঙ্গাররাশি সংগ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাও। যদি তোমার সৌভাগ্যক্রমে তথায় কোনও সাধুর সমাগম হয়, তবে তাঁহার পবিত্র স্পর্শে তোমার এই অঙ্গাররাশিও সুবর্ণে পরিণত হইতে পারে।"

আত্মীয় ও বান্ধবগণের এই পরামর্শ শুনিয়া, কৃপণের হৃদয়ে পুনর্ব্বার নবীন আশার সঞ্চার হইল। আশায় মুগ্ধ হইয়া, কৃপণ সেই অকিঞ্চিৎকর অঙ্গাররাশি সংগ্রহ করিয়া, বাজারে বিক্রয় করিতে গেল।

২

বাজারে কত ব্যবসায়ী কত দ্রব্য বিক্রয় করিতে

আসিয়াছে; কত ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় করিয়া চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু কেহ আর কৃপণের অঙ্গারপণ্যে দৃষ্টিপাত করিল না। যাহারা দয়া করিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহারাও উপহাস করিয়া চলিয়া গেল। এ সংসারে অঙ্গারের বিক্রেতা আছে, কিন্তু ক্রেতা নাই। কে সাধ করিয়া প্রতারিত হইতে চায়? যাহা এক জনের আশার স্থল, তাহা অপরের পক্ষে নিরাশার কারণ বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু কৃপণ নিরুত্তম হইল না। সে অঙ্গারস্তূপ সম্মুখে করিয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, হয় কোনও উপযুক্ত ক্রেতা, নয় কোনও সাধু মহাপুরুষের অনুকম্পায়, আমি এই অঙ্গারের বিনিময়ে সুবর্ণ লাভ করিব।

সেই সময়ে, কৃষ্ণাগৌতমীনাম্নী এক দরিদ্র বালিকা সেই পথে যাইতেছিল। জগতে কেহ তাহার আত্মীয় ছিল না। যিনি অনাথের ও বিপন্নের আশ্রয়, তিনি ভিন্ন, বালিকার আর কেহ আশ্রয় ছিল না। কৃষ্ণাগৌতমী, বাজারে বেড়াইতে বেড়াইতে কৃপণের অঙ্গাররাশির নিকটে গেল। কি আশ্চর্য্য! দরিদ্র বালিকার স্পর্শমাত্র সেই অঙ্গাররাশি সুবর্ণরূপে পরিণত হইল। কৃপণের আর আনন্দের অবধি রহিল না। সে যত্নপূর্ব্বক কৃষ্ণাকে গৃহে লইয়া গেল, এবং আদর করিয়া, স্বীয় পুত্রের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিল। যে অনাথা কৃষ্ণা পথের ভিখারিণী ছিল, সে

সাজি।

আজি ধনীর গৃহিণী হইয়া মহাসুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

৩

কৃষ্ণা পরম সুখে শ্বশুরালয়ে বাস করিতে লাগিল। আর তাহাকে দারিদ্র্যের কঠোর দুঃখ ভোগ করিতে হইত না। তখন সে ঐশ্বর্য্যপরিবৃতা হইয়া, ধনীর গৃহে দিন-যাপন করিতেছিল। দাম্পত্যপ্রেমের অমৃতময় রসাভিষেকে দুঃখিনীর দুঃখদগ্ধ হৃদয় সঞ্জীবিত হইতেছিল। কৃষ্ণা বিবা-হের চারি বৎসর পরে, দাম্পত্যপ্রেমবন্ধনের গ্রন্থিস্বরূপ এক পুত্রলাভ করিল। তাহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, সংসারে দুঃখ নাই। যে সংসারে এত সুখ, কেন লোকে সেখানে দুঃখের কল্পনা করিয়া কষ্ট পায়? এই সংসারেই ভিখারিণী রাজার রাণী হয়, আবার সেই রাজরাণী পুত্রবতী হইয়া অক্ষয় সুখ ভোগ করে। আমার সুখের সীমা নাই!

৪

এইরূপে কিছু দিন অতীত হইল। কৃষ্ণার নবজাত কুমার শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শিশু স্খলিতচরণে চলিয়া বেড়ায়; অর্দ্ধস্ফুটস্বরে মা বলিয়া ডাকে; কখনও হাসিয়া আকুল হয়; কখনও বা আয়ত পদ্মপলাশলোচনে মুক্তাবৎ স্বচ্ছ অশ্রুকণা বর্ষণ

করিতে করিতে মাতৃক্রোড়ে ধাবিত হয়; পরক্ষণে মাতার আকুল হৃদয়ের প্রদীপ্তবাসনাময় সহস্র চুম্বনে লাঞ্ছিত হইয়া আবার হাসিয়া উঠে। তখন শিশুর অশ্রুভারাবনত নয়ন-পল্লবে অব্যক্ত হর্ষের অস্ফুট ছায়া দেখিয়া কৃষ্ণা মনে করিত, বুঝি মেঘান্তে চন্দ্র ফুটিতেছে; বুঝি ক্ষণস্থায়িনী বৃষ্টির পরে মধুর রৌদ্র উঠিতেছে!

৫

কিন্তু চিরদিন কখনও সমান যায় না। যেমন বিমল-কৌমুদীময়ী প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ঝঞ্ঝাবাতে ক্ষণমধ্যে বিধ্বস্ত হইয়া যায়, মানবের সুখ-স্বপ্নও তেমনিই সহসা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। কৃষ্ণার সুখের দিন অতীত হইতে-ছিল; সহসা তাহার সুখের অবসান হইল। কৃষ্ণার জীবনের সুখ, আশার আলোক, আদরের শিশু, জননীর স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া অনন্তলোকে চলিয়া গেল। কৃষ্ণা-গৌতমী পুত্র হারাইয়া জ্ঞান হারাইল। শোকে উন্মত্ত হইয়া মৃতপুত্রকে বক্ষে লইয়া, দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, দ্বারে দ্বারে, মৃতসঞ্জীবন ঔষধের অন্বেষণ করিতে লাগিল।

কৃষ্ণা মৃত পুত্র লইয়া পথে পথে বেড়ায়। আর তাহার সে সৌন্দর্য্য নাই। সেই লাবণ্যময়ী প্রতিমার অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দেখিলে বোধ হইত, যেন করুণা মূর্ত্তি-

পরিগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছে, যেন সংসারে একখানি বিষাদ-ময়ী শোকচ্ছবি লোকের করুণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

কৃষ্ণা যাহাকে দেখিতে পায়, তাহাকেই বলে, "আমায় মৃতসঞ্জীবন ঔষধ দিতে পার?" জগতে যাহা নাই, কৃষ্ণাকে কে তাহা আনিয়া দিবে?

একদিন কৃষ্ণা কাঁদিতে কাঁদিতে পথে বেড়াইতেছে, এমন সময়ে দেখিতে পাইল, এক বৌদ্ধ ভিক্ষু সেই পথে আসিতেছেন। কৃষ্ণা মনে করিল, এই মহাপুরুষ আমার পুত্রের প্রাণদান করিতে পারেন। তখন সে ভিক্ষুর চরণে ধরিয়া, তাঁহার নিকট পুত্রের নবজীবনপ্রদ ঔষধ ভিক্ষা করিল। ভিক্ষু কৃষ্ণার কষ্ট দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। মনে মনে কহিলেন, এই রমণী মায়ায় বদ্ধ হইয়া কত কষ্টই সহিতেছে। তাহার পর তিনি কৃষ্ণাকে বলিলেন, "কল্যাণি! মৃত মানবকে নবজীবন দিতে পারি, আমার এমন ক্ষমতা নাই। তুমি বুদ্ধদেবের নিকট গমন কর, তিনি তোমায় উপযুক্ত ঔষধ দিবেন।"

কৃষ্ণা বৌদ্ধ ভিক্ষুর এই পরামর্শ শুনিয়া পুলকিত হইল। পাগলিনী মৃতপুত্রের জীবনাশায় মুগ্ধ হইয়া দ্রুতপদে বুদ্ধদেবের নিকট গমন করিল।

৬

কৃষ্ণা বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার চরণযুগলে

পতিত হইয়া, মৃতপুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করিল। সে কাতর-স্বরে, গলদশ্রুলোচনে, গদ্গদবচনে কহিল, "হে দেব! আমায় মৃতসঞ্জীবন ঔষধ দাও; আমার পুত্রের প্রাণদান কর।"

বুদ্ধদেব বলিলেন, "বৎসে! আমি ঔষধ জানি। কিন্তু তোমাকে ঔষধের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে। তুমি কতকগুলি সর্ষপ লইয়া আইস; আমি তোমায় ঔষধ দিব।"

সামান্য সর্ষপ সংগৃহীত করিতে পারিলেই মৃতপুত্র পুনর্ব্বার নবজীবন পাইবে, এই কথা শুনিয়া, কৃষ্ণা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন বুদ্ধ বলিলেন, "যাও, যে গৃহে কেহ কখনও মরে নাই, এমন গৃহ হইতে কতিপয় সর্ষপ লইয়া আইস।"

কৃষ্ণা মৃতপুত্র বক্ষে করিয়া গৃহস্থগণের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু যেথানে মৃত্যুর অধিকার বিস্তৃত হয় নাই, এমন গৃহ দেখিতে পাইল না। সকলেই বলিতে লাগিল, যে পরিবারে কেহ কখনও মরে নাই, এমন গৃহ তুমি কোথায় পাইবে? জগতে মৃত্যুই স্বাভাবিক; যাহারা মরিয়াছে, তাহাদেরই সংখ্যা অধিক। জীবিত ব্যক্তির সংখ্যা জগতে বড় অল্প! কে কবে মৃত্যুর গ্রাস হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে?

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখন কৃষ্ণার

সাজি।

আশায় উদ্দীপ্ত হৃদয় ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে নিরাশহৃদয়ে, অবসন্নশরীরে, ধীরে ধীরে নগরের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। হতভাগিনী তথায় বসিয়া উদাস-হৃদয়ে শোকসাগরের লহরী গণনা করিতে লাগিল।

৭

ক্রমে সূর্য্যের আলো নিভিয়া গেল। চতুর্দ্দিক গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। গগনপটে এক একটি করিয়া নক্ষত্র-কুসুম ফুটিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে। দিবসের কোলাহল ধীরে ধীরে দিক্‌চক্রবালের ক্রোড়ে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িতেছে। কৃষ্ণা প্রকৃতির এই শোকময় পুরে বসিয়া, স্বীয় হৃদয়ের সহিত তাহার তুলনা করিতেছে।

এমন সময়ে দূরে, নগরের অভ্যন্তরে দীপাবলী জ্বলিয়া উঠিল। কৃষ্ণা প্রজ্বলিত দীপশিখাগুলি একাগ্রমনে দেখিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি গভীর হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে সেই দীপগুলি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

তখন তেজঃপুঞ্জকলেবর বুদ্ধদেব কৃষ্ণার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নক্ষত্রখচিত নিবিড়নীলিমময় গগনচন্দ্রাতপের তলে মূর্ত্তিমান জ্ঞান দণ্ডায়মান; সম্মুখে মৃতপুত্র বক্ষে ধরিয়া সংসারের মায়া কাঁদিতেছে। বড় সুন্দর দৃশ্য! প্রকৃতি একদৃষ্টে সেই অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে লাগিলেন। এই

অপূর্ব্ব ক্ষেত্রে, এই শোকময় গম্ভীর সময়ে, এই মায়া ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব মিলনে, কি অমৃতময় ফল প্রসূত হয়, প্রকৃতি একাগ্রচিত্তে তাহা দেখিতে লাগিলেন।

সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বুদ্ধদেব বলিলেন, "ঐ দেখ! নগরের গৃহে গৃহে যে দীপগুলি এতক্ষণ জ্বলিতেছিল, তাহারা নিভিয়া গেল। কল্যাণি! মানবজীবনও ঐ দীপশিখার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। তাহারা ক্ষণকালের জন্য জ্বলিয়া উঠে, কিয়ৎকাল আলোক বিস্তার করিয়া অবশেষে ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। এই মানবজীবনের গূঢ় রহস্য।"

তখন সহসা কৃষ্ণার চৈতন্য হইল। বুদ্ধদেবের উপদেশে তাহার মোহমায়া দূরে গেল। সে মৃতপুত্রের শব অরণ্যমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, বুদ্ধের শিষ্যাশ্রেণীভুক্ত হইয়া নির্ব্বাণপদবীর পথিক হইল।

একদিন শোক যাহাকে বিজয় করিয়াছিল, জ্ঞানবীর বুদ্ধের সহায়তায় সে আজি শোকবিজয় করিল।

লালসা ও সংযম

লালসা ও সংযম।

১

মথুরানগরে বাসবদত্তা নামে এক পরমসুন্দরী বারবিলাসিনী বাস করিত। বিলাসলালসা তাহার পাপময় জীবনের সার-ব্রত ছিল; ইন্দ্রিয়সেবায় তাহার জীবন অতিবাহিত হইত। এই সুখদুঃখময় বিচিত্র জগতে বিষয়বাসনা ভিন্ন আর কিছু তাহার বরণীয় ছিল না; সে আর কিছু জানিত না; সে আর কিছু চাহিত না।

একদিন সে দেখিতে পাইল, উপগুপ্ত-নামক বুদ্ধদেবের এক শিষ্য রাজপথ দিয়া গমন করিতেছেন। উপগুপ্ত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরত্নে ভূষিত ছিলেন। মানসিক সৌন্দর্য্যে তাঁহার বাহ্যশ্রী আরও সুশোভিত হইয়াছিল। এই নবীন সন্ন্যাসীর ধর্ম্মোজ্জ্বল মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া বাসবদত্তার পাপপূর্ণ হৃদয়ে পাপবাসনা জাগিয়া উঠিল। পাপীয়সী সৌন্দর্য্যলালসায় অন্ধ হইয়া উপগুপ্তের প্রণয়-কামনায় তাঁহার নিকট দূতী পাঠাইয়া দিল।

বুদ্ধের উপযুক্ত শিষ্য উপগুপ্ত ধীরভাবে বাসবদত্তার প্রার্থনা শুনিলেন। অবশেষে সেই আত্মজয়ী ব্রহ্মচারী বলি-

সাজি।

লেন, "আমি এখন বাসবদত্তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিব না। বাসবদত্তার নিকটে যাইতে পারি, সে সময় এখনও হয় নাই।"

এই উত্তরে, বাসবদত্তার অদমনীয় লালসাস্রোত থামিল না। বাধা পাইয়া তাহার হৃদয় উত্তেজিত হইল; কামনার ঐকান্তিক গতি আরও প্রবল হইয়া উঠিল। সে মনে করিল, উপগুপ্ত সময়ের অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন। পাপীয়সী বার বার দূতী পাঠাইয়া উপগুপ্তের প্রণয়ভিক্ষা করিত; কিন্তু উপযুক্ত সময় আর আসিল না। উপগুপ্ত একবারও তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না।

২

এইরূপে কিছু দিন অতীত হইয়া গেল। এই সময়ে, একদিন, বাসবদত্তা অর্থলোভে তাহার এক প্রণয়ীর প্রাণ-সংহার করিল। কিন্তু তাহার পাপকার্য্য প্রচ্ছন্ন রহিল না। অবশেষে রাজকীয় বিচারে, তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। রাজকর্ম্মচারিগণ, সেই সৌন্দর্য্যশালিনী রূপজীবিনী রমণীর রূপদৃপ্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া, তদীয় কবন্ধ ভূতলে প্রোথিত করিবার আদেশ পাইয়াছিল। তাহারা হতভাগিনীর হস্ত পদ ছিন্ন করিয়াছে, এমন সময়ে, অপূর্ব্বলাবণ্যময় ধর্ম্মধন উপগুপ্ত সেই বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইলেন।

কিন্তু তখনও হতভাগিনীর সৌন্দর্য্যতৃষ্ণা ও বিষয়-লালসা চরিতার্থ হয় নাই। তখনও বাসবদত্তা উপগুপ্তকে ভুলিতে পারে নাই। তখনও তাহার হৃদয়ে উপগুপ্তের প্রণয়প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত ছিল। হতভাগিনী আসন্নকালেও আশার মায়াজাল ছিন্ন করিতে পারিল না। উপগুপ্তের আগমনে তাহার দারুণ যন্ত্রণা দূরে গেল। পূর্ব্বস্মৃতি ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল। সে দাসীদিগকে আদেশ করিল, "তোমরা আমার ছিন্ন ভিন্ন হস্তপদ বস্ত্র দিয়া ঢাকিয়া দাও।" দাসীরা তাহার আজ্ঞা পালন করিল। এমন সময়ে উপগুপ্ত বাসবদত্তার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

বাসবদত্তা অনিমেষনয়নে চাহিয়া দেখিল। তাহার সঙ্কীর্ণ হৃদয় প্রেমে, আনন্দে ও আবেশে পূরিয়া উঠিল। হতভাগিনী ধীরে ধীরে প্রেমাশ্রুপূর্ণনয়নে রোমাঞ্চিতকলেবরে বলিতে লাগিল, "যখন আমার এই শরীর পদ্মের ন্যায় সুরভি ছিল, যখন এই শরীর মণিমুক্তায় জড়িত ছিল, তখন তোমায় আমি হৃদয়ের প্রেম উপহার দিয়াছিলাম। এখন আমার দেহে হস্ত নাই, পদ নাই; এখন আমার দেহ রুধিরে রঞ্জিত ও কর্দ্দমে লুণ্ঠিত হইতেছে। এখন তুমি এলে!"

তখন প্রশান্তবদনে উপগুপ্ত বলিলেন, "ভগিনি! অলীক সুখের আশায়, বা মিথ্যা আমোদের লোভে আমি

সাজি।

তোমার নিকট আসি নাই। সৌন্দর্য্যের পিপাসায় আমি অভিভূত নহি; সৌন্দর্য্যভোগের আশায় আমি তোমার নিকট আসি নাই। শারীরিক সৌন্দর্য্য নিতান্ত অসার। দেখ বাসবদত্তে! বিষয়বাসনাই তোমার এই বিপদের ও এই যন্ত্রণার একমাত্র কারণ। যদি তুমি লোভের বশী-ভূত না হইতে, যদি তুমি অহঙ্কার জয় করিতে, যদি তুমি স্ত্রীলোকের প্রধান ভূষণ লজ্জা পরিহার না করিতে, যদি তুমি কায়মনোবাক্যে সৌন্দর্য্যসেবা না করিতে, যদি তুমি সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্য একাগ্রচিত্ত না হইতে, তাহা হইলে আজি তোমার এত দুর্দ্দশা ঘটিত না। তুমি পরমসুখে সংসারের শান্তি উপভোগ করিতে পারিতে। বুঝিয়া দেখ, বিষয়তৃষ্ণাই তোমার সকল অনর্থের মূল।”

বাসবদত্তা যাঁহাকে পাপজীবন অর্পণ করিয়াছিল, তিনি অাজ তাহাকে নবজীবন দান করিলেন! হতভাগিনী উপগুপ্তের সারগর্ভ উপদেশ শুনিয়া মোহিত হইল, তাহার হৃদয়ে নূতন ভাব জাগিয়া উঠিল। আসন্নকালে তাহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের উদয় হইল। বাসবদত্তা অন্তিমকালে সংসারের সুখমরীচিকার অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পর-লোকে চলিয়া গেল।

এই বাসবদত্তাই মর্ত্ত্যের রাগময়ী লালসা; এই উপ-গুপ্তই স্বর্গের বিরাগধন সংযম।